

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার

রোলঃ 23100120048

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার

রোলঃ 23100120048

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন আক্তার, আইডিঃ 23100120048 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ শারফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

শারমিন আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

শারমিন আক্তার

আইডিঃ 23100120048

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়; মৃত্যু.....	6
রুহ কবজের পূর্বে কী ঘটে?	6
মৃত্যুর যন্ত্রনা;.....	8
মুমিনের মৃত্যু:.....	10
কাফেরের মৃত্যু	12
দ্বিতীয় অধ্যায়; কবরের জীবন	15
কবরের জীবন;.....	15
নেককার ব্যক্তির কবরের অবস্থা;.....	18
গুনাহগার ব্যক্তির কবরের অবস্থা;	21
গুনাহগার ব্যক্তির কবরের শাস্তি	23
নবীণগ এবং গুহাদাগণের বারযাখ.....	24
কবর অনন্তকাল যাত্রার প্রথম ধাপ.....	26
তৃতীয় অধ্যায়; পরকালের জন্য প্রস্তুতি	28
সহীহ আকীদা লালন করা;.....	28
ফরজ ইবাদতে কোনো ছাড় নেই;.....	35
হক্কুল ইবাদ - বান্দার হক আদায়	37
গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা.....	40
গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে ইস্তেগফার করা;	44
সুন্নাতের উপর পাবন্দি;.....	47
নফল ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ;.....	53
সদাকায়ে জারিয়া ;	56
জবান ও অন্তরের পাথেয়;.....	60
অন্তরের পাথেয়;.....	64

অধিকহাৰে মৃত্যুৰ স্মৰণ;.....	68
আল্লাহ'ৰ আযাবেৰ ভয়	74
সদা জানাতের প্রত্যাশা;	76
ৰবের দিদার লাভের আকাঙ্ক্ষা;	81
দৈনন্দিন ইসলামিক জীবন;	86

প্রথম অধ্যায়; মৃত্যু

রুহ কবজের পূর্বে কী ঘটে?

মৃত্যু এক বাস্তব সত্য, অস্বীকার করার উপায় নেই। পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা কুরআন অস্বীকার করেছে, নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ'র বিধি-বিধান মানে না। কিন্তু এমন কেউ নেই যে, যে মৃত্যুকে অস্বীকার করেছে। এটা এমন এক অকাট্য সত্য, যা প্রতিদিন আমাদের চারপাশে ঘটতে দেখা যায়। আমাদের চর্মচক্ষু এসবের সত্যতা দিন-রাত প্রত্যক্ষ করছে। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে বলেছেন -

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে(সূরা : আল-ইমরান, আয়াত ১৮৫)।

এই আয়াতই আমাদের আত্মা কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মৃত্যু আমাদের সবচেয়ে সুন্দর জীবনের সমাপ্তি ঘটাবে। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

তোমরা যেখানেই অবস্থান করো না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থা কর। (সূরা নিসা: ৭৮)

অর্থাৎ মানুষ মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য যত শক্তিশালী দুর্গের ভিতর নিজেকে আবদ্ধ রাখুন না কেন, মৃত্যু কোনো অবস্থাতেই পিছু ছাড়বে না। কেননা সবার জন্যই মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, এ থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।

মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ রুহ কবজের পূর্বে কিছু আলামত দেখা যায়,

১। রুহ কবজের পূর্বে মৃত্যুর আলামত শুরু হয়।

আল্লাহ বলেন: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ "মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসবে"। (সূরা রুফ, ১৯ আয়াত)

তখন মানুষের অবস্থা বদলাতে থাকে:

চোখ স্থির হয়ে যায় - উপরের দিকে তাকিয়ে থাকে

নাক বাঁকা হয়ে যায় - কপালে ঘাম দেখা দেয় মুমিনের ক্ষেত্রে।

পায়ের গোছা শুকিয়ে যায় -

কুরআনে এসেছে: وَالنَّفْسُ السَّاقُطَةُ بِالسَّقَطِ

পায়ের নলা এক পায়ের নলার সাথে জড়িয়ে যাবে। (সূরা আল ক্বিয়ামাহ: আয়াত ২৯)

শ্বাসকষ্ট হয়, গলায় গড়গড় শব্দ হয় - একে "গরগরা" বলে।

২। ফেরেশতাদের আগমন হয়

রুহ বের হওয়ার আগেই ফেরেশতা আসে। ফলে সে ফেরেশতা দেখতে পায়। দুনিয়ার পর্দা উঠে যায়।

৩। তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়,

গলায় গড়গড় শব্দ শুরু হলে, রুহ কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছালে তওবা কবুল হয় না।

ফেরাউন ডুবে মরার সময় ঈমান এনেছিল, কিন্তু কবুল হয়নি। কারণ আল্লাহ বলেন:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

আর তাদের জন্য তওবা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলে, আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্যও, যারা কাফির অবস্থায় মারা যায়। এরাই তারা যাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। (সূরা নিসা: আয়াত ১৮)

৪। পরিবার-পরিজন দেখতে পায় না।

মৃত্যুপথযাত্রী যা দেখে, পাশে বসা লোকজন তা দেখে না। এজন্য রাসূল সা. বলেছেন:

"তোমরা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন দাও"। (সহীহ মুসলিম, হাদিস

৯১৬) কারণ শয়তান তখন ধোঁকা দিতে আসে। বাবা-মায়ের সুরতে এসে বলে: "ইহুদি হয়ে মর, খ্রিস্টান হয়ে মর"। (আত-তায়কিরাহ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৬)

৫। রুহ বের হওয়ার স্থান,

আলেমরা বলেন, নেককারের রুহ মুখ, নাক দিয়ে সুগন্ধি ছড়িয়ে বের হয়। আর পাপীর রুহ পায়ের দিক থেকে টেনে বের করা হয়, দুর্গন্ধ ছড়ায়।

মৃত্যুর যন্ত্রনা;

মৃত্যুর আগ মুহূর্তে শয়তান মুমিনের ঈমান হরণের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। সে মুমিনের সামনে তার প্রিয়জন, যেমন মা-বাবার রূপ ধরে এসে কুফরি বা সংশয় ছড়াতে পারে। এই কঠিন সময়ে শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতে ঈমানের ওপর অটল থাকা এবং আল্লাহর সাহায্য চাওয়াই একমাত্র উপায়।

পিতামাতার রূপ: শয়তান মানুষের সামনে তার মৃত পিতা বা মাতার রূপ ধরে এসে বলতে পারে, "তুমি ইহুদি বা খ্রিস্টান হয়ে মারা যাও, কারণ আমি এই ধর্মের পথ পেয়েছি"।

ঈমান হরণ: শয়তান ঈমানদার ব্যক্তিকে তার জীবনের শেষ মুহূর্তে সংশয়বাদী বা নাস্তিক বানানোর জন্য প্ররোচিত করে।

ওয়াসওয়াসা: মৃত্যুর অসহ্য যন্ত্রণার সময় শয়তান মনে নানা ধরনের কুচিন্তা ও সন্দেহ তৈরি করে।

স্বয়ং রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর সময় কষ্ট হয়েছে।

আয়েশা রা. বলেন:

রাসূল ﷺ এর ইন্তেকালের সময় তাঁর কাছে একটি পানির পাত্র ছিল। তিনি তাতে হাত ডুবিয়ে মুখ মুছতেন আর বলতেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ

অর্থ: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নিশ্চয়ই মৃত্যুর অনেক যন্ত্রণা রয়েছে"।(সহীহ বুখারী ৬৫১০)

আনাস রা. বলেন:

রাসূল ﷺ যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছিলেন, ফাতিমা রা. বললেন, "হায় আমার আব্বার কষ্ট"।

রাসূল ﷺ বললেন, "আজকের পর তোমার আব্বার আর কোনো কষ্ট থাকবে না"।

রেফারেন্স: সহীহ বুখারী ৪৪৬২

এথেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর সময় কষ্ট হয়েছে, তাহলে আমাদের নিশ্চিত থাকার কোনো উপায় নেই।

এ থেকে বাঁচার উপায়:আল্লাহর কাছে শয়তানের ধোঁকা থেকে আশ্রয় চাওয়া। যেমন;
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

উচ্চারণ:আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার থেকে জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।

ঈমানের ওপর অবিচল থাকার জন্য দুআ করা।আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা রাখা।মৃত্যুর সময় শয়তানের এহেন ধোঁকা থেকে বাঁচতে সুস্থ থাকাকালীন সময়েই ঈমান মজবুত করা এবং নেক আমল করা।

মুমিনের মৃত্যু:

মুমিনের মৃত্যু দুনিয়ার কষ্টের শেষ আর আখিরাতের শান্তির শুরু। কুরআন-হাদিসে মুমিনের মৃত্যুর যে চিত্র এসেছে সেটা খুবই আশার।

১. মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের আচরণ;

সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৩০: আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفَافُوا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

অর্থ: "নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, তারপর অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হয় এবং বলে, তোমরা ভয় পেয়ো না, দুঃখ করো না। আর তোমাদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও"।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতাআলা আরো বলেন, সূরা নাহল, আয়াত ৩২:

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ

অর্থ: "ফেরেশতারা যাদের পবিত্র অবস্থায় মৃত্যু ঘটায়, তারা বলে, তোমাদের উপর সালাম। তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো"।

২. রুহ বের হওয়ার ধরন;

বারা ইবনে আযিব রা. থেকে দীর্ঘ হাদিস:

রাসূল ﷺ বলেন, "মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতের দিকে যাত্রা করে, তখন আসমান থেকে সাদা চেহারার ফেরেশতারা জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি নিয়ে আসে। মৃত্যুর ফেরেশতা তার মাথার কাছে বসে বলে: হে পবিত্র আত্মা, আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে আসো। তখন রুহ এমন সহজে বের হয় যেমন কলসি

থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে"। (মুসনাদ আহমাদ ১৮৫৩৪, সুনান আবু দাউদ ৪৭৫৩। হাকিম সহীহ বলেছেন, যাহাবী সমর্থন করেছেন।)

এরপর ফেরেশতারা সেই রুহকে জান্নাতি কাফনে জড়িয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে আসমানে নিয়ে যায়। আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

৩. মুমিনের মৃত্যুযজ্ঞা কি হয়?

হ্যাঁ, হয়। রাসূল ﷺ নিজেও সাকারাতুল মাউত অর্থাৎ মৃত্যুর যজ্ঞা ভোগ করেছেন। সহীহ বুখারী ৬৫১০

কিন্তু এটা শাস্তি না। ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন: "মুমিনের মৃত্যুযজ্ঞা তার গুনাহের কাফফারা"। অর্থাৎ এই কষ্টের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন, মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

৪. মুমিন মৃত্যুকে কিভাবে দেখে?

রাসূল ﷺ বলেন:

"যে আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন"। আয়েশা রা. বললেন, আমরা তো মৃত্যু অপছন্দ করি। তিনি বললেন, ব্যাপারটা তা নয়। বরং মুমিনকে যখন মৃত্যুর সময় আল্লাহর রহমত ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে। (সহীহ বুখারী ৬৫০৭, সহীহ মুসলিম ২৬৮৩)

৫. মুমিনের মৃত্যুর আলামত;

হাদিসে কিছু ভালো মৃত্যুর আলামত এসেছে:

১. শেষ কথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নসিব হওয়া।

(আবু দাউদ;৩১১৬)

২. কপাল ঘেমে যাওয়া - তিরমিযী; ৯৮২

৩. জুমার দিন বা রাতে মৃত্যু - তিরমিযী; ১০৭৪

৪. শহীদি মৃত্যু- পেটের রোগ, পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, প্রসবকালে ইত্যাদি।
বুখারী; ২৮২৯

মূলত, মুমিনের জন্য মৃত্যু ভয়ের না, বরং প্রিয়জনের সাথে মিলনের মতো। ফেরেশতারা সালাম দেয়, সুসংবাদ দেয়, জান্নাতি কাফন নিয়ে আসে। যন্ত্রণা হলেও সেটা গুনাহ মাক্ফের কারণ।

তাই আমাদের কাজ হলো ঈমান ও আমল ঠিক রাখা, আর দোয়া করা:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْفَاك

"হে আল্লাহ, আমার জীবনের শেষ অংশকে সর্বোত্তম করুন, আমার শেষ আমলকে সর্বোত্তম করুন, আর আপনার সাথে সাক্ষাতের দিনকে আমার সর্বোত্তম দিন বানান।"

কাফেরের মৃত্যু

কাফেরের মৃত্যু কেমন হয়

কুরআন ও হাদিসে কাফের, মুনাফিক ও পাপাচারী ব্যক্তির মৃত্যুর যে ভয়াবহ চিত্র এসেছে, তা মুমিনের মৃত্যুর সম্পূর্ণ বিপরীত।

১. কুরআন থেকে

সূরা আনফাল, আয়াত ৫০:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

অর্থ:"আর যদি তুমি দেখতে, যখন ফেরেশতারা কাফেরদের জান কবজ করে, তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে বলে, তোমরা জ্বলন্ত আযাব আশ্বাদন করো।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরো বলেন, সূরা আনআম, ৯৩ আয়াতে;

"যদি তুমি দেখতে, যখন জালেমরা মৃত্যুব্রণায় থাকবে আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করো। আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে"।

সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ২৭:

"অতঃপর তাদের কী দশা হবে, যখন ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ হরণ করবে।

এথেকে পরিষ্কার বোঝা গেল, কাফেরদের মৃত্যু হবে ভয়াবহ যন্ত্রনাদায়ক। যা থেকে পালাবার কোনো সুযোগ নেই।

২. হাদিস থেকে কাফেরের রুহ বের হওয়ার ধরন;

বারা ইবনে আযিব রা. থেকে দীর্ঘ হাদিস:

রাসূল ﷺ বলেন, "আর কাফের বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতের দিকে যাত্রা করে, তখন আসমান থেকে কালো চেহারার ফেরেশতারা মোটা চটের কাফন নিয়ে আসে। মৃত্যুর ফেরেশতা তার মাথার কাছে বসে বলে: হে খবিস আত্মা, আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে আয়। তখন রুহ শরীরের মধ্যে লুকাতে চায়। ফেরেশতা তাকে টেনে বের করে, যেমন ভেজা পশম থেকে লোহার শিক টেনে বের করা হয়, ফলে শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে যায়"।

এরপর সেই রুহকে চটের কাফনে জড়ানো হয়। তা থেকে মৃত দেহের দুর্গন্ধের চেয়েও তীব্র দুর্গন্ধ বের হয়। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে আসমানে উঠতে চাইলে আসমানের দরজা খোলা হয় না। (মুসনাদ আহমাদ ১৮৫৩৪, সুনান আবু দাউদ ৪৭৫৩। ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন।)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে"। সূরা আ'রাফ ৪০

৩. কাফেরের মৃত্যুর সময় যা ঘটে;

আযাবের ফেরেশতা: কালো চেহারা, ভয়ংকর আকৃতি। তাদের দেখেই কাফের ভয় পেয়ে যায়।

মারধর: ফেরেশতার মুখে ও পিঠে আঘাত করতে থাকে। (সূরা আনফাল ৫০)

ভয়াবহ সুসংবাদ: ফেরেশতা বলে, "বের হয়ে আয় আল্লাহর ক্রোধের দিকে"। তখন সে দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাইবে, কিন্তু সময় শেষ।

আফসোস: "হায়, যদি আমাকে ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে আমি নেক কাজ করতাম"। (সূরা মুমিনুন ৯৯-১০০)। কিন্তু তখন তওবার দরজা বন্ধ। (সূরা নিসা-১৮)

যে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন"। আয়েশা রা. জিজ্ঞেস করলেন, আমরা তো মৃত্যু অপছন্দ করি। তিনি বললেন, ব্যাপারটা তা নয়। বরং কাফেরকে যখন মৃত্যুর সময় আল্লাহর আযাব ও ক্রোধের খবর দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আর আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। (সহীহ বুখারী ৬৫০৭, সহীহ মুসলিম ২৬৮৩)

মূলত; মুমিনের মৃত্যু হয় শান্তিতে, সালাম ও সুসংবাদ দিয়ে। আর কাফেরের মৃত্যু হয় লাঞ্ছনা, মারধর ও আযাবের ধমক দিয়ে। রুহ বের হতেই চায় না, জোর করে টেনে বের করা হয়।

এজন্যই আল্লাহ সূরা নিসার ১৮ নম্বর আয়াতে বলেছেন, যারা কুফর অবস্থায় মারা যায় তাদের জন্য যজ্ঞদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

আমাদের জন্য শিক্ষা হলো, মৃত্যু আসার আগেই ঈমান ও আমল ঠিক করে নেওয়া। কারণ মৃত্যুর ফেরেশতা দেখার পর আর কোনো সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়; কবরের জীবন

কবরের জীবন;

কবরের জীবন - বারযাখের জীবন

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়কে "বারযাখ" বলে। এই সময়টাই কবরের জীবন। এটা দুনিয়া আর আখিরাতের মাঝখানের একটা জগত।

কবরের জীবন হক - কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আর তাদের পেছনে রয়েছে বারযাখ, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত"। (সূরা মুমিনুন, আয়াত ১০:)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতা'আলা আরো বলেন,

"আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত, তাদের রবের কাছে রিযিকপ্রাপ্ত"।

শহীদদের রুহ বারযাখে বিশেষ নেয়ামতে থাকে।(সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৬৯)

সূরা গাফিরে আরো বলেন,

ফেরাউনের অনুসারীদের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, "আগুন, সকাল-সন্ধ্যা তাদেরকে তার সামনে উপস্থিত করা হয়। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন বলা হবে, ফেরাউনের অনুসারীদেরকে কঠিন আযাবে নিষ্ক্ষেপ করো"। সূরা গাফির, আয়াত ৪৬

এটা প্রমাণ করে কিয়ামতের আগেও কবরে আযাব আছে।

কবরের প্রশ্ন ও পরীক্ষা;

রাসূল ﷺ বলেন, মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর দুজন ফেরেশতা আসে। তাদের নাম মুনকার ও নাকির।

তারা জিজ্ঞেস করে:

মান রব্বুকা? তোমার রব কে?

মা দ্বীনুকা? তোমার দ্বীন কী?

মা হাযার রাজুল? এই ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল? অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ এর কথা জিজ্ঞেস করা হবে।

কবরের নেয়ামত ও আযাব;

নেয়ামত:

কবর প্রশস্ত হয়, জান্নাতের বাগান হয়ে যায়। জান্নাতের পোশাক, বিছানা, সুগন্ধি দেওয়া হয়। কিয়ামত পর্যন্ত জান্নাতের দৃশ্য দেখানো হয়। সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি।

রাসূল ﷺ বলেন, কবর হয় জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান, নয়তো জাহান্নামের গর্তগুলোর একটি গর্ত। (তিরমিযী ২৪৬০)

আযাব:

কবর সংকুচিত হয়, পাঁজর ভেঙে যায়।

জাহান্নামের আগুনের দৃশ্য দেখানো হয়।

সাপ, বিছু ও বিভিন্ন আযাব দেওয়া হয়।

গীবত, পেশাব থেকে না বাঁচা, চোগলখুরি, নামাজ না পড়ার কারণে আযাব হয়। (বুখারী ১৩৬১, মুসলিম ২৯২)

কবরে মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়;

রাসূল ﷺ বদরের কাফেরদের লাশকে ডেকে বলেছিলেন। সাহাবীরা বলল, আপনি কি মৃতদের ডাকছেন? তিনি বললেন, তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শোনো না। তবে তারা উত্তর দিতে পারে না। (বুখারী ১৩৭০)

কবরের আযাব-নেয়ামত রূহ ও শরীর দুটোই অনুভব করে, তবে কিভাবে সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। এটা দুনিয়ার জীবনের মতো না।

কবরের আযাব থেকে বাঁচার আমল;

রাসূল ﷺ শিখিয়েছেন:

নামাজের শেষে দোয়া:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই"।

(বুখারী ১৩৭)

সূরা মুলক তিলাওয়াত: "এই সূরা তার পাঠকারীর জন্য কবরের আযাব থেকে রক্ষাকবচ হবে"। (তিরমিযী ২৮৯০, হাসান)

সদকা, সৎ আমল, গীবত-চোগলখুরি থেকে বাঁচা। মূলত কবরের জীবন আছে। এখানে প্রশ্ন হবে, আমলের হিসেবে নেয়ামত বা আযাব শুরু হবে। এটা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। কবরই আখিরাতের প্রথম ধাপ।

এজন্য রাসূল ﷺ সবসময় কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইতেন। আমাদেরও উচিত নেক আমল করে কবরকে জান্নাতের বাগান বানোর চেষ্টা করা। ইনশাআল্লাহুল আজিজ।

নেককার ব্যক্তির কবরের অবস্থা;

নেককার মুমিনের কবর দুনিয়ার কষ্ট শেষ হওয়ার পর প্রথম জান্নাতের টুকরো হয়ে যায়। কুরআন-হাদিসে এটাকে "রাওদা মিন রিয়াদিল জান্নাহ" বলা হয়েছে।

কবরের প্রশ্নের উত্তর ও সুসংবাদ;

মুনকার-নাকিরের ৩টা প্রশ্নের জবাব নেককার ব্যক্তি সহজে দেয়:

রাসূল ﷺ বলেন:

মুমিন বান্দাকে যখন কবরে বসানো হয়, ফেরেশতা আসে। সে বলে ;

- আমার রব আল্লাহ
- আমার ধীন ইসলাম
- আমার নবী মুহাম্মদ ﷺ

তখন আসমান থেকে ঘোষণা হয়: ‘আমার বান্দা সত্য বলেছে’

এরপর বলা হয়:

- তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও।
- তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও।
- জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দাও।
- তার কবরকে তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দাও।
- জান্নাতের বাতাস ও সুগন্ধি তার কাছে আসতে থাকে।(মুসনাদ আহমাদ ১৮৫৩৪, আবু দাউদ ৪৭৫৩। ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন।)

কবরের অবস্থা;

কবর প্রশস্ত হয়:

রাসূল ﷺ বলেন, "মুমিনের কবর ৭০ হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়, আর তা নূরে আলোকিত হয়"।

রেফারেন্স: তিরমিযী ১০৭১, হাসান

জান্নাতের বাগান হয়ে যায়:

"কবর হয় জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান, নয়তো জাহান্নামের গর্তগুলোর একটি গর্ত"।

রেফারেন্স: তিরমিযী ২৪৬০, হাসান

কিয়ামত পর্যন্ত ঘুমের মতো থাকে:

নেককার ব্যক্তিকে বলা হয়, "তুমি ঘুমাও নবধূর মতো, যাকে তার প্রিয়জন ছাড়া কেউ জাগায় না"। সে কিয়ামতের সুসংবাদ শুনে আরামে থাকে।

রেফারেন্স: তিরমিযী ১০৭১

নেককারদের রুহের অবস্থান;

শহীদদের রুহ: সবুজ পাখির পেটে থাকে। তারা জান্নাতে ঘুরে বেড়ায়, আরশের নিচে বুলন্ত ঝাড়বাতিতে বসে। (মুসলিম ১৮৭)

অন্য নেককারদের রুহ:

ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, মুমিনের রুহ ইল্লিয়ীনে থাকে। ইল্লিয়ীন সপ্তম আসমানে জান্নাতের নিচে। (মুসনাদ আহমাদ ১৮৫৩৪)

কিন্তু শরীর কবরে থাকে, আর রুহ বারযাখে নেয়ামতে থাকে। কিয়ামতে আবার মিলিত হবে।

নেককারদের কবরের অবস্থা;

কারণ তার দুনিয়ার জীবন এমন ছিল:

- তাওহীদের উপর অটল ছিল।
- নামাজ, রোজা, সদকা করতো।
- গুনাহ থেকে বাঁচতো, তওবা করতো।
- আল্লাহর স্মরণে থাকতো।

আল্লাহ বলেন:

"যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ, তারপর অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে নাযিল হয় এবং বলে: তোমরা ভয় পেয়ো না, দুঃখ করো না। তোমাদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও"। (সূরা ফুসিলাত ৩০)

নেককারের কবরের আলামত;

হাদিসে এসেছে, কিছু নেককারের কবর থেকে সুগন্ধি বের হয়, কবর ভেজা থাকে না, জমিন খায় না। তবে এটা সবার জন্য শর্ত না। আসল বিষয় হলো আখিরাতের নেয়ামত। নেককারের কবর অন্ধকার না, বরং নূর ও প্রশান্তির জায়গা হয়। সেখানে ফেরেশতারা সালাম দেয়, জান্নাতের দরজা খোলা থাকে, আর সে কিয়ামত পর্যন্ত আরামে থাকে।

এজন্যই রাসূল ﷺ দুআ করতেন:

"হে আল্লাহ, আমার কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও, জাহান্নামের গর্ত বানিয়ে না"।

গুনাহগার ব্যক্তির কবরের অবস্থা;

গুনাহগার বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে সেই মুমিনকে যে ঈমান নিয়ে মারা গেছে, কিন্তু অনেক গুনাহ করেছে, তওবা করেনি। কাফেরদের কবরের আযাব আলাদা। গুনাহগার মুমিনের কবরে আযাব হতে পারে, আবার আল্লাহ চাইলে মাফও করে দিতে পারেন।

গুনাহগার ব্যক্তির কবরের প্রশ্ন ও উত্তর;

রাসূল ﷺ বলেন, মুনকার-নাকির ফেরেশতা এসে জিজ্ঞেস করে: তোমার রব কে? তোমার দীন কী? এই ব্যক্তি কে?

গুনাহগার মুমিনের অবস্থা দুই রকম হয়:

১.যদি সে ঈমান ঠিক রাখে, কিন্তু আমলে দুর্বল থাকে, তখন সে উত্তর দিতে পারে:

"আমার রব আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল"।

কিন্তু আমল কম থাকায় তার কবর সংকুচিত হয়, অথবা কিছুদিন আযাব হয়। আল্লাহ আ'লাম

২.যদি গুনাহের কারণে সে হক ভুলে যায়, তখন সে বলে: "হা হা, আমি জানি না। লোকদের যা বলতে শুনেছি তাই বলেছি"।

তখন তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়।

রেফারেন্স: সহীহ বুখারী ১৩৭৪, সহীহ মুসলিম ২৮৭০

কবরের আযাবের কারণ ও ধরন;

হাদিসে গুনাহগার মুমিনের কবরের আযাবের কিছু কারণ এসেছে:

ক.গীবত ও চোগলখুরি:

রাসূল ﷺ দুই কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বললেন, "এদের আযাব হচ্ছে, অথচ বড় কোনো গুনাহের জন্য নয়। একজন পেশাব থেকে বাঁচতো না, আরেকজন চোগলখুরি করতো"। রেফারেন্স:সহীহ বুখারী ২১৬, সহীহ মুসলিম ২৯২

খ. নামাজ না পড়া, কুরআন ছেড়ে দেওয়া:

সহীহ বুখারী ৭০৪৭ এর দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, যারা ফজরের নামাজ ছেড়ে ঘুমায়, যারা কুরআন শিখে ভুলে যায়, তাদের মাথা পাথর দিয়ে ভাঙা হয়, মুখ চিরে দেওয়া হয়।

গ. সুদ খাওয়া, যিনা করা:

একই হাদিসে এসেছে, সুদখোর রক্তের নদীতে সাঁতার কাটে। ব্যভিচারী তন্দুরের মতো চুলায় আযাব পায়।

ঘ. কবর সংকুচিত হওয়া:

রাসূল ﷺ বলেন, "কবর মুমিনকে এমনভাবে চাপ দেয় যে তার পাঁজর একটার সাথে আরেকটা মিশে যায়"। সা'দ ইবনে মুয়ায রা. এর মতো সাহাবীরও হয়েছে, যদিও তিনি জান্নাতি ছিলেন। রেফারেন্স: মুসনাদ আহমাদ ৬৭৫৬, সহীহ

আযাব চিরস্থায়ী না সাময়িক;

গুনাহগার মুমিনের আযাব সাময়িক হয়। যদি সে মুশরিক না হয়।

- কিছু গুনাহের কারণে কবরে কিছুদিন আযাব হবে।
- তারপর আল্লাহর রহমত, অন্যের দোয়া, সদকার কারণে আযাব বন্ধ হয়ে যায়।
- কিয়ামতে সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে যাবে, যদি ঈমান নিয়ে মারা যায়।

দলিল: রাসূল ﷺ বলেন, "যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নাম থেকে বের হবে"।

রেফারেন্স: সহীহ বুখারী ৪, সহীহ মুসলিম ১৯৩

৪. কবরের আযাব কমানোর উপায়

- মৃত্যুর আগেই তওবা করা: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন"। (সূরা বাকারা ২)

- জীবিতদের দুআ ও সদকা: মৃতের জন্য মাগফিরাতের দুআ করলে উপকার হয়। (মুসলিম ১৬৩১)

-কবরের আযাব থেকে দুআ: নামাজের শেষে পড়ো:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

হে আল্লাহ আমি কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।

রেফারেন্স: (সহীহ বুখারী ১৩৭)

-সূরা মুলক পড়া: রাসূল ﷺ বলেন, "সূরা মুলক কবরের আযাব থেকে বাঁচায়"।

রেফারেন্স: (তিরমিযী ২৮৯০, হাসান)

গুনাহগার ব্যক্তির কবরের শান্তি

গুনাহগার মুমিনের কবর নেককারের মতো নয়। গুনাহ অনুযায়ী কবর সংকুচিত হয়, আযাব হয়। কিন্তু ঈমান থাকলে আযাব চিরস্থায়ী হয় না। আল্লাহ চাইলে মাফ করে দেন, নয়তো কিছুদিন আযাব দিয়ে পাক করে জান্নাতে দেন।

এজন্যই রাসূল ﷺ দুআ করতেন: "হে আল্লাহ, আমি কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই"।

নবীগণ এবং শুহাদাগণের বারযাখ

নবীগণ ও শুহাদাগণের বারযাখের জীবন

সাধারণ মুমিনের বারযাখ থেকে নবী ও শহীদদের বারযাখ আলাদা। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদা।

১.নবীগণের বারযাখ

তাঁরা কবরে জীবিত:

রাসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ জমিনের জন্য নবীদের দেহ খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহর নবী জীবিত, বিশেষ রিযিকপ্রাপ্ত"।

সালাম শোনে ও জবাব দেন:

"যখন কেউ আমাকে সালাম দেয়, আল্লাহ আমার রুহ ফিরিয়ে দেন যাতে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি"।

কবরে ইবাদত করেন:

মিরাজের রাতে রাসূল ﷺ মুসা আ. কে তাঁর কবরে নামাজ পড়তে দেখেছেন।

এটা দুনিয়ার জীবনের মতো না। খাওয়া-দুমানো নেই, কিন্তু তারা বারযাখে সজ্ঞান আছেন এবং আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করছেন।

২.শুহাদাগণের বারযাখ

তাঁরা মৃত নয়, জীবিত:

আল্লাহ বলেন: "আল্লাহর রাস্তায় যারা নিহত হয়, তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝো না।

রুহের অবস্থান:

রাসূল ﷺ বলেন, "শহীদদের রুহ সবুজ পাখির পেটে থাকে। তাঁরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়। তারপর আরশের নিচে ঝুলন্ত ঝাড়বাতিতে বিশ্রাম নেয়"।

কবরের আযাব থেকে মুক্ত:

রাসূল ﷺ বলেন, শহীদের জন্য কবরের ফিতনা যথেষ্ট, তার তলোয়ারের ঝনঝনানিই যথেষ্ট।

কবরের প্রশ্ন ও আযাব তাদের হয় না।

সাধারণ মুমিনের সাথে পার্থক্য;

সাধারণ মুমিনের কবরের প্রশ্ন হয়, আর নবীরা আগেই ক্ষমাপ্রাপ্ত।

রুহের অবস্থান; সাধারণ মুমিনের রুহ ইল্লিয়ীনে বা কবরের কাছে অবস্থান করে। আর শহীদ রুহ: সবুজ পাখিতে জান্নাতে ঘোরে এবং নবীগণের রুহ রওজায়। আল্লাহ আ'লাম

মনে রাখার বিষয়;

১. এটা দুনিয়ার জীবন না, এটা বারযাখি জীবন। কেমন সেটা আল্লাহই ভালো জানেন।
২. আমরা নবী-শহীদদের কাছে কিছু চাইবো না। শুধু তাদের জন্য দুআ করবো।
৩. তাদের মর্যাদা দেখে আমাদের উচিত তাকওয়া ও জিহাদের প্রতি আগ্রহ বাড়ানো।

নবী ও শহীদরা বারযাখে বিশেষ নেয়ামতে আছেন। তারা জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত এবং জান্নাতি নেয়ামত ভোগ করছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সম্মান।

কবর অনন্তকাল যাত্রার প্রথম ধাপ

দুনিয়া হলো পরীক্ষার হল। মৃত্যু হলো পরীক্ষা শেষের ঘণ্টা। আর কবর হলো রেজাল্ট আসার আগের অপেক্ষার কক্ষ।

রাসূল ﷺ বলেন:

"কবর হলো আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল। যে এখানে মুক্তি পেল, তার পরের সব ধাপ সহজ। আর যে এখানে আটকে গেল, তার জন্য পরের ধাপগুলো আরও কঠিন।" (তিরমিযী ২৩০৮, হাসান)

১. যে কারণে কবর প্রথম ধাপ;

কারণ মৃত্যুর সাথে সাথে বারযাখের জীবন শুরু হয়। দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এখন থেকে শুরু হয় আসল হিসাব।

আল্লাহ বলেন:

"আর তাদের পেছনে রয়েছে বারযাখ, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত" (সূরা মুমিনুন ১০)

২. কবর বা বারযাখের পর কিয়ামত:

কিয়ামত মানে হলো পুনরুত্থানের দিন। যে দিন এই দুনিয়া ধ্বংস হবে, সব মানুষকে কবর থেকে তুলে আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে হিসাবের জন্য।

কিয়ামতের দিন যা ঘটবে;

শিঙায় ফুঁৎকার: ইসরাফিল আলাইহিস সালাম প্রথমবার ফুঁক দিলে সবকিছু ধ্বংস হবে। দ্বিতীয়বার ফুঁক দিলে সবাই জীবিত হয়ে উঠবে।

হাশরের ময়দান: সবাই উলঙ্গ, খালি পায়ে, খাতনাবিহীন অবস্থায় এক মাঠে জড়ো হবে। সূর্য মাথার এক হাত উপরে থাকবে।

হিসাব: প্রত্যেকের আমলনামা দেওয়া হবে। ডান হাতে পেলে জান্নাতি, বাম হাতে পেলে জাহান্নামি।

মিযান: ভালো-মন্দ কাজ ওজন করা হবে। এক সরিষা পরিমাণ নেকিও বৃথা যাবে না।
পুল-সিরাত: জাহান্নামের উপর স্থাপিত সেতু। নেককাররা বিদ্যুতের মতো পার হবে।
গুনাহগাররা পড়ে যাবে।

৩. ফলাফল;

মুত্তাকী: আল্লাহর আরশের ছায় স্থান পাবে। হিসাব সহজ হবে। সরাসরি জান্নাতে যাবে।

কাফের-মুশরিক: চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

গুনাহগার মুমিন: গুনাহ অনুযায়ী শাস্তি পেয়ে একসময় জান্নাতে যাবে, যদি শিরক না করে থাকে।

৪. কিয়ামতের শিক্ষা

কিয়ামতের কথা স্মরণ করলে দুনিয়ার মোহ কমে যায়। গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি পাওয়া যায়।

রাসূল ﷺ বলেন: "বুদ্ধিমান সে, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরের জন্য কাজ করে"।

মূলত দুনিয়া ৬০-৭০ বছরের খেলা। কিয়ামত হলো আসল দিন। সেদিন টাকা, ক্ষমতা কিছুই কাজে আসবে না। কাজে আসবে শুধু ঈমান আর নেক আমল। তাই আজই হিসাব মিলিয়ে নাও। কিয়ামতের দিন হিসাব সহজ হবে। ইন শা আল্লাহ।

তৃতীয় অধ্যায়; পরকালের জন্য প্রস্তুতি

সহীহ আকীদা লালন করা;

সহীহ আকীদা অর্থ হলো বিশুদ্ধ বিশ্বাস। যে বিশ্বাস কুরআন, সহীহ হাদিস আর সাহাবীদের বুঝ অনুযায়ী হয়। আকীদা ঠিক না থাকলে নামাজ-রোজা সব বরবাদ। কারণ আমল কবুলের প্রথম শর্ত হলো সহীহ আকীদা।

রাসূল ﷺ বলেন: _"বনী ইসরাঈল ৭২ দলে ভাগ হয়েছিল। আমার উম্মত ৭৩ দলে ভাগ হবে। একটা দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে"_। সাহাবিরা জিজ্ঞাস করলেন: তারা কারা? বললেন: _"যারা আমি আর আমার সাহাবিরা যে পথে আছি, সেই পথে থাকবে"(তিরমিজি ২৬৪১)
এটাই সহীহ আকীদা।

সহীহ আকীদার ৬টি মূল স্তম্ভ — ঈমানের রুকন

এগুলোর একটাতে ভুল করলে ঈমান থাকে না।

১. আল্লাহর উপর ঈমান;

-তাওহীদুর রুবুবিয়াহ: আল্লাহ একাই সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, সবকিছুর মালিক।

_ "বলো, কে আসমান-জমিন থেকে তোমাদের রিজিক দেয়? আল্লাহ"(সূরা ইউনুস: ৩১)

-তাওহীদুল উলুহিয়াহ: ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য। নামাজ, রোজা, দুআ, মানত, সিজদা, কুরবানি—সব আল্লাহর জন্য। মাজারে সিজদা, পীরের মাজারে কোনো কিছু চাওয়া শিরক।

- তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত: আল্লাহর ৯৯ নাম ও গুণ আছে। যেমন তিনি আরশের উপরে আছেন। (সূরা ত্বাহা: ৫), তাঁর হাত আছে (সূরা মায়েদা: ৬৪), তিনি কথা বলেন (সূরা নিসা: ১৬৪), কিন্তু কেমন? _"তাঁর মতো কিছুই নাই"(সূরা শূরা: ১১)। অর্থ বুঝাবো, কিন্তু ধরণ নিয়ে কল্পনা করবো না।

ভুল আকীদা: আল্লাহ সব জায়গায় আছেন, আল্লাহ নিরাকার, ওলীরা গায়েব জানে, রাসূল ﷺ হাজির-নাজির।

২. ফেরেশতাদের উপর ঈমান;

জিবরাঈল ওহী আনেন, মিকাইল বৃষ্টির দায়িত্বে, ইসরাফিল শিঙায় ফুঁ দেবেন, মালাকুল মউত জান কবজ করেন। তারা নূরের তৈরি, আল্লাহর অবাধ্য হন না।

৩. আসমানী কিতাবের উপর ঈমান;

তাওরাত, জাবুর, ইনজিল, কুরআন—সব আল্লাহর কালাম। তবে আগের কিতাব বিকৃত হয়েছে। এখন মানতে হবে শুধু কুরআন। _"আজ আমি তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করলাম"(সূরা মায়েদা: ৩)

৪. রাসূলদের উপর ঈমান;

আদম আ. থেকে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সবাই সত্য নবী। সবাই তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী। তাঁর পর কেউ নবী দাবি করলে কাফির। _"মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী"(সূরা আহযাব: ৪০)

ভুল আকীদা: রাসূল ﷺ নূরের তৈরি, তিনি গায়েব জানতেন, তিনি মারা যাননি।

সঠিক: তিনি মানুষ, মাটির তৈরি (সূরা কাহফ: ১১০), তিনি মারা গেছেন (সূরা যুমার: ৩০), গায়েব জানতেন না (সূরা আনআম: ৫০)

৫. আখিরাতের উপর ঈমান;

মৃত্যু, কবরের আজাব-শান্তি, কিয়ামত, হাশর, মিয়ান, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম—সব সত্য। _"যে অণু পরিমাণ ভালো করবে তা দেখবে, খারাপ করবে তাও দেখবে"_ (সূরা যিলযাল: ৭-৮)

৬. তাকদীরের উপর ঈমান;

ভালো-মন্দ সব আল্লাহর ফয়সালা ও জ্ঞানে আছে। তবে মানুষকে বিবেক-ইচ্ছা দেওয়া হয়েছে। তাই পাপ করলে দায়ী মানুষ নিজেই। "আল্লাহ কোনো প্রাণের উপর তার সাধ্যের বেশি বোঝা চাপান না"(সূরা বাকারা: ২৮৬)

২. সহীহ আকীদা লালন খুব জরুরি;

১. *জান্নাতের চাবি*: _"যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং সেই অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে যাবে"_ *বুখারী ৫৮২৭*। কিন্তু শর্ত হলো শিরক মুক্ত থাকা।

২. *আমল কবুলের শর্ত*: শিরক থাকলে সব আমল বাতিল। _"যদি তুমি শিরক করো, তোমার আমল বরবাদ হয়ে যাবে"_ *সূরা যুমার: ৬৫*

৩. *বিভ্রান্তি থেকে বাঁচায়*: ৭২ দল জাহান্নামী। সহীহ আকীদা না জানলে কোন দলে পড়ে যাবো টেরও পাবো না।

৪. *অন্তরে শান্তি আনে*: সব আল্লাহর হাতে—এই বিশ্বাস টেনশন দূর করে।

৩. কীভাবে সহীহ আকীদা লালন করবে?

১. *ইলম অর্জন করো*

আকীদা শিখা ফরজে আইন। ৩টা বই দিয়ে শুরু করো:

- *কিতাবুত তাওহীদ* — শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব

- *আকীদাতুত তহাবী* — ইমাম তহাবী রহ.

- *উসুলুস সালাসা* — শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব

ইউটিউবে সহীহ আকীদার আলেমদের দারস শোনো: ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ., শাইখ মতিউর রহমান মাদানী।

২. *কুরআন-হাদিস আঁকড়ে ধরো*

নিজের যুক্তি, স্বপ্ন, কাশফ দিয়ে ধর্ম বোঝা যাবে না। _"আজ আমি তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করেছি"_ *সূরা মায়েরা: ৩*। দ্বীন পূর্ণ, নতুন কিছু ঢুকানোর দরকার নাই।

৩. *সাহাবীদের বুঝ অনুসরণ করো*

কুরআনের আয়াত সাহাবিরা যেভাবে বুঝেছেন, সেভাবে বুঝতে হবে। _"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম সারির, আর যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট"_ *সূরা তওবা: ১০০*

৪. *শিরক-বিদআত থেকে বাঁচো*

শিরক: মাজারে মানত, তাবিজ-কবজে ভরসা, গণক-জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস, পীরকে আল্লাহর মতো ভয় করা।

বিদআত: মিলাদ, চল্লিশা, শবে বরাতে বিশেষ নামাজ, মৃতের নামে কুরআন খতম।
রাসূল ﷺ বলেন: _"যে আমাদের দ্বীনে নতুন কিছু ঢুকালো, তা বাতিল"_ *বুখারী ২৬৯৭*

৫. *আল-ওয়ালা ওয়াল বারা করো*

আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করবে। তাওহিদবাদীকে ভালোবাসো, শিরক-কুফরকে ঘৃণা করো। তবে জুলুম করবে না।

৬. *সন্দেহ হলে আলেমকে জিজ্ঞাস করো*

"যদি না জানো, জ্ঞানীদের জিজ্ঞাস করো" *সূরা নাহল: ৪৩*। কিন্তু আলেম যেন কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী হয়।

৪. সহীহ আকীদার ৫টা আলামত

১. *তাওহিদে গাইরত*: আল্লাহর হক নষ্ট হলে রাগ লাগে। কেউ শিরক করলে অন্তর কাঁদে।

২. *সুন্নাহর মহব্বত*: রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ ছোট হলেও ছাড়তে কষ্ট হয়। দাড়ি, টাখনুর উপর কাপড়, মিসওয়াক।

৩. *বিদআত ঘৃণা*: সমাজে প্রচলিত হলেও বিদআত দেখলে গা জ্বলে।

৪. *সাহাবীদের সম্মান*: সব সাহাবিকে ভালোবাসে, গালি দেয় না। _"আমার সাহাবিদের গালি দিও না"_ *বুখারী ৩৬৭৩*

৫. *শাসকের জন্য দোয়া*: মুসলিম শাসক জালিম হলেও গোপনে দোয়া করে, বিদ্রোহ করে না। এটাই আহলুস সুন্নাহর নীতি।

৫. সতর্কতা: আকীদা নষ্টকারী ৩ বিষয়

১. *অতিরঞ্জন*: নবী-ওলীকে আল্লাহর স্তরে উঠানো। খ্রিস্টানরা ঈসা আ. কে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে।
২. *অস্বীকার*: আল্লাহর নাম-গুণ অস্বীকার করা, কবরের আজাব অস্বীকার করা।
৩. *সাদৃশ্য দেওয়া*: আল্লাহর হাতকে মানুষের হাতের মতো ভাবা। অথচ _"তাঁর মতো কিছুই নাই"_ *সূরা শূরা: ১১*

সারকথা

সহীহ আকীদা হলো জান্নাতের টিকিট। আমল হলো গাড়ি। টিকিট ছাড়া গাড়িতে উঠে লাভ নাই।

ইমাম মালিক রহ. বলেন: _"এই উম্মতের শেষ অংশ সংশোধন হবে না, তবে সেই পথে যা দিয়ে প্রথম অংশ সংশোধন হয়েছিল"_। আর প্রথম অংশ সংশোধন হয়েছিল সহীহ আকীদা দিয়ে।

তাই আজ থেকে নিয়ত করো:

১. প্রতিদিন ১০ মিনিট আকীদার বই পড়বো।
২. জীবন থেকে শিরক-বিদআত বের করবো।
৩. সন্তানকে কালেমার অর্থ শেখাবো।

দোয়া: _"আল্লাহুম্মা আরিনাল হাক্কাহাক্কাহু ওয়ারজুকনাজতিবাহ"আহ, ওয়া আরিনাল বাতিলা বাতিলাও ওয়ারজুকনাজতিবাহ"_

হে আল্লাহ, সত্যকে সত্য হিসেবে দেখাও ও তার অনুসরণের তৌফিক দাও, বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখাও ও তা থেকে বাঁচার তৌফিক দাও।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সাহাবীদের আকীদার উপর মৃত্যু দিন। আমিন।

তোমার কোন বিষয়ে আকীদা নিয়ে সন্দেহ আছে? বলো, দলিল দিয়ে ক্লিয়ার করি।

ঈমান ঠিক রাখা;

ঈমান ঠিক রাখা মানে হলো আল্লাহ, রাসূল ﷺ, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসকে মজবুত রাখা এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। ঈমান কমে-বাড়ে। নেক কাজে বাড়ে, গুনাহে কমে। তাই একে আগলে রাখতে হয়।

ঈমান ঠিক রাখার ৫ টা মূল কাজ;

১. কুরআন ও নামাজকে আঁকড়ে ধরা;

নামাজ ঈমানের স্তম্ভ। দিনে ৫ বার আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে দুনিয়ার ময়লা মন থেকে সরে যায়।

আর কুরআন পড়ো অর্থ বুঝো। ১০ মিনিট হলেও প্রতিদিন। এটাই অন্তরকে জিন্দা রাখে।

২. ভালো সঙ্গ বেছে নেওয়া

"মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের উপর হয়" - হাদিস।

যারা আল্লাহকে স্মরণ করে, তাদের সাথে থাকো। একা থাকলে শয়তান ধোঁকা দেয় সহজে।

৩. গুনাহ দেখলেই তওবা করা

ঈমানদার পাপ করলেও ডুবে থাকে না। সাথে "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলে ফিরে আসে।
দেরি করলেই অন্তর কালো হয়ে যায়।

৪. মৃত্যু ও আখিরাত স্মরণ করা

প্রতিদিন ২ মিনিট ভাবো - আজ যদি মরে যাই?

এই একটা ভাবনাই অনেক গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

৫. দোয়া করা

রাসূল ﷺ সবচেয়ে বেশি এই দোয়া পড়তেন:

"ইয়া মুকাল্লিবালা কুলুব, সাব্বিত কালবি আলা দীনিক"

অর্থ: হে অন্তরের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর স্থির রাখো।

তিরমিজি ২১৪০

২. ঈমান দুর্বল হলে বোঝা যায় কিভাবে

- নামাজে অলসতা আসে
- গুনাহ করেও খারাপ লাগে না
- কুরআন শুনলে মন নড়ে না
- দুনিয়ার লোভ বেড়ে যায়

৩. সারকথা;

ঈমান একটা গাছের মতো। পানি না দিলে শুকিয়ে যায়।

পানি = ইবাদত, জিকির, ভালো সঙ্গ, ইলম।

রোদ-বৃষ্টি = পরীক্ষা, কষ্ট। এগুলোই ঈমানকে মজবুত করে।

আল্লাহ বলেন:

"যারা ঈমান আনে এবং সংকাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পবিত্র জীবন দান করব"

সূরা নাহল: ৯৭

ফরজ ইবাদতে কোনো ছাড় নেই;

ফরজ ইবাদতে কোনো ছাড় নেই এটাই ইসলামের মূলনীতি।

১. কেন ছাড় নেই?

ফরজ মানে আল্লাহর সরাসরি হুকুম। যেটা করতেই হবে। আল্লাহ বলেন:

"নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ করা হয়েছে"

সূরা নিসা: ১০৩

রাসূল ﷺ মৃত্যুর আগ পর্যন্তও নামাজ ছাড়েননি। অসুস্থ অবস্থায়ও ইশারায় নামাজ পড়েছেন।

২. কিন্তু শরিয়ত "ছাড়" নয়, "সহজতা" দিয়েছে

আল্লাহ কাউকে সাধের বাইরে বোঝা দেন না। তাই ফরজের পদ্ধতিতে কিছু ছাড় আছে, ফরজ ছেড়ে দেওয়ার ছাড় নেই।

নামাজের ক্ষেত্রে:

সপ্তম

- দাঁড়াতে না পারলে বসে, বসতে না পারলে শুয়ে, ইশারায় পড়বে।
- সফরে ৪ রাকাত নামাজ ২ রাকাত পড়বে, জমা করতে পারবে।
- পানি না পেলে তায়াম্মুম করবে।

রোজার ক্ষেত্রে:

- অসুস্থ, মুসাফির, গর্ভবতী হলে পরে কাজা করবে।
- বৃদ্ধ, স্থায়ী অসুস্থ হলে ফিদিয়া দেবে।

হজের ক্ষেত্রে:

- শুধু যার সামর্থ্য আছে, তার উপর ফরজ।

যাকাতের ক্ষেত্রে:

- শুধু নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে ফরজ।

মানে *আসল ফরজটা বাদ যায় না*, শুধু আদায়ের নিয়মটা পরিস্থিতি অনুযায়ী সহজ হয়।

৩. যেখানে সত্যিই কোনো ছাড় নেই

৪টা জিনিস এমন, যার কোনো বিকল্প নেই:

১. নামাজ - মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। পাগল, অজ্ঞান ছাড়া মাফ নেই।
২. রোজা - রমজানে সুস্থ ও মুকিম হলে রাখতেই হবে।
৩. যাকাত - সম্পদ থাকলে দিতেই হবে।
৪. হজ - একবার জীবনে, সামর্থ্য থাকলে।

এগুলো ছেড়ে দিলে গুনাহে কবীরা হয়। ইচ্ছা করে নামাজ ছেড়ে দেওয়া নিয়ে আলেমদের এক অংশ এটাকে কুফরির কাছাকাছি বলেছেন।

দুনিয়ার অফিসের বস ডাকলে ছুটি না নিয়ে পারো না। আর আসমান-জমিনের মালিক ডাকলে "সময় নাই" বলবে?

ফরজ হলো চুক্তি। তুমি মুসলিম হয়েছো মানে এই চুক্তিতে সই করেছো। তাই অলসতা, কাজের ব্যস্ততা, মন ভালো নাই — এগুলো শরিয়তি ওজর না।

হ্যাঁ, ক্লান্ত হলে, বিপদে পড়লে আল্লাহ সহজ করে দেন। কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার লাইসেন্স দেন না।

হক্কুল ইবাদ - বান্দার হক আদায়

হক্কুল ইবাদ মানে "বান্দার হক" - অর্থাৎ এক মানুষের উপর আরেক মানুষের যে অধিকার আছে।

ইসলামে দায়িত্ব ২ প্রকার:

1. হক্কুল্লাহ - আল্লাহর হক। যেমন নামাজ, রোজা। এটা আল্লাহ চাইলে মাফ করে দিতে পারেন।
2. হক্কুল ইবাদ - বান্দার হক। এটা আল্লাহ মাফ করেন না যতক্ষণ না যার হক নষ্ট হয়েছে সে মাফ করে দেয়।

এজন্যই পুলসিরাতের পর "কানতারা" নামক জায়গায় এই হিসাব নেওয়া হবে।

১. হক্কুল ইবাদ কতটা গুরুতর?

রাসূল ﷺ বলেন:

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপর জুলুম করেছে, মান-সম্মান বা অন্য কিছুতে, সে যেন আজই তা মিটিয়ে নেয়, যেদিন দিনার-দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার নেকি থাকলে তা নিয়ে নেওয়া হবে। নেকি না থাকলে মজলুমের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে" - সহীহ বুখারী ২৪৪৯

সাহাবীরা একে সবচেয়ে ভয় পেতেন। কারণ হক্কুল্লাহর গুনাহ তওবায় মাফ হয়, কিন্তু হক্কুল ইবাদে মাফ পেতে হলে যার হক নষ্ট করেছো তাকে রাজি করাতে হয়।

২. হক্কুল ইবাদ কয় প্রকার?

মূলত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. মালের হক

- চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, ওজনে কম দেওয়া
- ধার নিয়ে না দেওয়া, আমানত খেয়ানত করা
- অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা

আল্লাহ বলেন:

"তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না" (সূরা নিসা: ২৯)

খ. ইজ্জত-সম্মানের হক

- গীবত করা, অপবাদ দেওয়া, কাউকে গালি দেওয়া
- কাউকে হেয় করা, উপহাস করা, খোঁটা দেওয়া
- গোপন কথা ফাঁস করা

রাসূল ﷺ বলেন:

_"মুসলিমের সবকিছু অন্য মুসলিমের জন্য হারাম - তার রক্ত, তার সম্পদ, তার ইজ্জত" (সহীহ মুসলিম ২৫৬৪)

গ. শারীরিক ও মানসিক হকের হক

- কাউকে মারা, আঘাত করা, ভয় দেখানো
- মানসিক নির্যাতন, ব্ল্যাকমেইল করা
- কাউকে অন্যায়ভাবে বন্দি রাখা

ঘ. সামাজিক ও পারিবারিক হক

- মা-বাবার হক নষ্ট করা
- স্ত্রী/স্বামীর হক না দেওয়া
- সন্তানের লালন-পালনের হক নষ্ট করা
- প্রতিবেশীর হক নষ্ট করা
- কর্মচারীর পারিশ্রমিক আটকে রাখা

রাসূল ﷺ বলেন:

— "জিবরাঈল আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত তাগিদ দিয়েছেন যে আমার মনে হয়েছে তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে দেবেন" (সহীহ বুখারী ৬০১৪)

৩. হক নষ্ট করলে মুক্তির উপায় কী?

যদি হক নষ্ট করে ফেলো, তাহলে ৩টা কাজ করতে হবে:

১. তওবা করা - আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া
২. হক ফিরিয়ে দেওয়া - টাকা নিলে ফেরত দাও, জিনিস নিলে ফেরত দাও
৩. মাফ চাওয়া - যার হক নষ্ট করেছো তার কাছে গিয়ে মাফ চাও। সে মাফ না করলে কিয়ামত পর্যন্ত ঝুলে থাকবে।

যদি সে মারা যায় বা খুঁজে না পাও, তাহলে তার নামে সাদাকা করে দাও, তার জন্য দোয়া করো। আল্লাহর কাছে দোয়া করো যেন কিয়ামতে তিনি নিজে বিষয়টা মিটিয়ে দেন।

৪. দৈনন্দিন জীবনে যেসব ছোট হক আমরা ভুলে যাই

এগুলোও হক্কুল ইবাদ:

- রাস্তায় কাউকে কষ্ট দেওয়া
- লাইনে দাঁড়িয়ে সিরিয়াল না মানা
- ওয়াদা করে ভঙ্গ করা
- কাউকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া
- অফিসে কাজ ফাঁকি দেওয়া অথচ পুরো বেতন নেওয়া
- সোশ্যাল মিডিয়ায় কাউকে অপমান করা

৫. মূলকথা;

হক্কুল্লাহ মিস করলে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে মাফ পাওয়া যায়।
কিন্তু হক্কুল ইবাদ মিস করলে তোমাকে সেই মানুষের দরবারে দৌড়াতে হবে।

তাই রাসূল ﷺ বলতেন:

_"মুমিন হলো সে, যার হাত ও জবান থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে" সহীহ বুখারী

১০

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা মানে নিজেকে আগুন থেকে বাঁচানো। কারণ প্রতিটা গুনাহ
অন্তরে একটা কালো দাগ ফেলে। দাগ বাড়তে বাড়তে অন্তর মরে যায়।

আল্লাহ বলেন:

_"যে নিজেকে পবিত্র করে, সে-ই সফল হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে-ই
ব্যর্থ হয়"_

(সূরা শামস: ৯-১০)

১. গুনাহ কেন হয়? মূল কারণ ৪টা

গুনাহ এমনি এমনি হয় না। এর পেছনে থাকে:

১. নফসের কুপ্রবৃত্তি- মন খারাপ কাজে টানে
২. শয়তানের ধোঁকা - "একবার করো, কিছু হবে না" বলে ফুসলায়
৩. খারাপ সঙ্গ - "সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে"
৪. গাফলতি - মৃত্যু, আখিরাত ভুলে যাওয়া

এই ৪টাকে কন্ট্রোল করতে পারলে গুনাহ ৭০% কমে যায়।

২. গুনাহ থেকে বাঁচার ৭টা প্র্যাকটিক্যাল উপায়

১. গুনাহের পরিবেশ থেকে দূরে সরে,

যে জায়গা, যে মোবাইল, যে বন্ধু তোমাকে গুনাহে টানে, সেটা থেকে দূরে যাও।

ইউসুফ আঃ জেল বেছে নিলেন, কিন্তু গুনাহ বেছে নিলেন না।

টিপস: ফোনে হারাম কনটেন্টের অ্যাপ, গ্রুপ, পেজ আনফলো করে দাও আজই।

২. *খালি সময়কে ভরাট করো*

খালি মন শয়তানের কারখানা। নামাজ, কুরআন, জিকির, বই পড়া, কাজ - যেকোনো কিছু দিয়ে ব্যস্ত রাখো।

রাসূল ﷺ বলেন: _"দুটি নেয়ামত সম্পর্কে মানুষ ধোঁকায় থাকে - সুস্থতা ও অবসর"_
সহীহ বুখারী ৬৪১২

৩. মৃত্যু ও কবরকে স্মরণ করো

প্রতিদিন ২ মিনিট ভাবো - আজ যদি মরে যাই, আমি কি প্রস্তুত?

এই একটা ভাবনা হারাম ভিডিও বন্ধ করে দেয়, মিথ্যা বলা আটকে দেয়।

৪. নেক সঙ্গ বেছে নাও

যারা আল্লাহকে ভয় পায়, তাদের সাথে চলো। তাদের কথায়, কাজে তোমার ঈমান বাড়বে।

_ "মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের উপর হয়" - আবু দাউদ ৪৮৩

৫. গুনাহ হয়ে গেলে সাথে তওবা করো

শয়তান চায় তুমি গুনাহ করে হতাশ হয়ে যাও। কিন্তু আল্লাহ বলেন:

_ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন" -

(সূরা বাকারা: ২২২)

দেরি করলেই অন্তর কালো হয়।

৬. চোখ ও জবানকে কন্ট্রোল করো

গুনাহের ৯০% শুরু হয় চোখ দিয়ে দেখা বা জবান দিয়ে বলা থেকে।

টিপস: হারাম কিছু চোখে পড়লে সাথে চোখ সরিয়ে নাও। এটাকে "গাদ্দুল বাসার" বলে।

৭. দোয়া করা

নিজের শক্তিতে গুনাহ ছাড়া যায় না। রাসূল ﷺ এই দোয়া পড়তেন:

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল হুদা, ওয়াত-তুকা, ওয়াল আফাফা, ওয়াল গিনা"

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, চরিত্রের পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা চাই।

সহীহ মুসলিম ২৭২১

৩. গুনাহের ক্ষতি কী?

গুনাহ শুধু আখিরাতের ক্ষতি না, দুনিয়াতেও মারে:

- অন্তর অশান্ত হয়
- রিজিকে বরকত কমে
- চেহার নূর চলে যায়
- ইবাদতে মজা পাও না
- মানুষের সামনে লজ্জা লাগে

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন: _"আমি ওয়াকি রহ. এর কাছে আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তির অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, গুনাহ ছেড়ে দাও। ইলম হলো নূর, আর আল্লাহর নূর গুনাহগারকে দেওয়া হয় না"_

৪. ছোট গুনাহ নিয়ে হেলাফেলা করো না

রাসূল ﷺ বলেন:

"তোমরা ছোট গুনাহকে তুচ্ছ মনে কোরো না। ছোট গুনাহ জমতে জমতে মানুষকে ধ্বংস করে দেয়"

(মুসনাদ আহমাদ ২৮৬৯)

একটা কাঠি দিয়ে আগুন জ্বলে না। কিন্তু অনেক কাঠি জমলে দাবানল হয়।

মূলত, গুনাহ থেকে বাঁচা মানে নিজেকে ভালোবাসা।

আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দিতে চান না। তিনি বলেন:

"আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন যদি তোমরা শোকর করো ও ঈমান আনো?"

(সূরা নিসা: ১৪৭)

গুনাহ ছাড়া কঠিন লাগবে প্রথম ৪০ দিন। এরপর এটা অভ্যাস হয়ে যাবে। আর তখন গুনাহ করতেই খারাপ লাগবে।

গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে ইস্তেগফার করা;

গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে ইস্তেগফার করা — এটা ঈমানদারের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

শয়তান চায় তুমি গুনাহ করে হতাশ হয়ে যাও, ভাবো "আমার দ্বারা আর হবে না"। কিন্তু আল্লাহ চান তুমি ফিরে আসো।

১. কেন সাথে ইস্তেগফার করতে হয়?

কারণ ১: গুনাহ অন্তরে দাগ ফেলে

রাসূল ﷺ বলেন:

"বান্দা যখন গুনাহ করে, তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে। যদি সে তওবা করে, তাহলে দাগ মুছে যায়। আর যদি গুনাহ বাড়ায়, দাগও বাড়ে"

(তিরমিজি ৩৪)

দেরি করলে দাগ জমে যায়। তখন অন্তর মরে যায়, গুনাহ করতেও খারাপ লাগে না।

কারণ ২: মৃত্যু কখন আসবে কেউ জানে না।

এই গুনাহের উপর মরে গেলে? সাথে ইস্তেগফার মানে তুমি তওবার হালতে মরার চেষ্টা করলে।

কারণ ৩: আল্লাহ খুশি হন

রাসূল ﷺ বলেন:

"বান্দা যখন গুনাহ করে ফেলে, তারপর বলে 'হে রব, আমি গুনাহ করেছি, আমাকে মাফ করে দাও', আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা জানে তার একজন রব আছে যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং গুনাহের জন্য পাকড়াও করেন। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম" (সহীহ বুখারী ৭৫০৭)

২. ইস্তেগফার মানে কী?

শুধু মুখে "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলা না। সত্যিকারের ইস্তেগফারে ৩টা জিনিস থাকে:

1. গুনাহ ছেড়ে দেওয়া - এখনই বন্ধ করো
2. অনুতপ্ত হওয়া - মনে কষ্ট লাগা যে আল্লাহর নাফরমানি করলে।
3. আর না করার দৃঢ় সংকল্প - ভবিষ্যতে না করার নিয়ত

যদি হক্কুল ইবাদ নষ্ট হয়, তাহলে ৪র্থ শর্ত হলো যার হক্ক নষ্ট করেছো তাকে ফিরিয়ে দেওয়া/মাফ চাওয়া।

৩. কুরআন ও হাদিসে ইস্তেগফারের ফজিলত

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

- _"তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল"_ (সূরা নূহ: ১০)

"যে কেউ মন্দ কাজ করে অথবা নিজের উপর জুলুম করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু হিসেবে পাবে"_
(সূরা নিসা: ১০)

হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন:

"আল্লাহর কসম, আমি দিনে ৭০ বারের বেশি ইস্তেগফার করি" (সহীহ বুখারী ৬৩০৭)
অথচ উনার তো কোনো গুনাহ ছিল না। উনি আমাদের শেখানোর জন্য করতেন।
"যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার করে, আল্লাহ তাকে সব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেন, সব সংকট থেকে বের করার পথ করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দেন যা সে কল্পনাও করেনি"(আবু দাউদ ১৫১৮)

৪. সবচেয়ে শক্তিশালী ইস্তেগফার: সাইয়্যিদুল ইস্তেগফার

রাসূল ﷺ বলেন, এটা পড়ে মরে গেলে জান্নাতি হবে:

আল্লাহুমা আনতা রাব্বি, লা ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাকতানি ওয়া আনা আবদুক, ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতু, আউজু বিকা মিন শাররি মা সানাতু, আবুউ লাকা বিনিমাতিকা আলাইয়া, ওয়া আবুউ বিজাম্বি, ফাগফিরলি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা।

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি আমার রব। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমি তোমার নিয়ামত স্বীকার করি, আমি আমার গুনাহ স্বীকার করি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

সহীহ বুখারী ৬৩০৬

সকাল-সন্ধ্যা ১ বার পড়ার অভ্যাস করো।

৫. প্র্যাকটিক্যাল টিপস

১. গুনাহ করলে ৩ সেকেন্ডও দেরি কোরো না - সাথে বলো "আস্তাগফিরুল্লাহ"।
২. নিয়ম বানাও - প্রত্যেক গুনাহের পর ১০ বার ইস্তেগফার পড়বে। এটা জরিমানার মতো কাজ করে।
৩. ফোনে রিমাইন্ডার সেট করো - "গুনাহ হলে ইস্তেগফার" লিখে রাখো।
৪. গুনাহের জায়গা ছেড়ে দাও - যেখানে গুনাহ করলে, সেখান থেকে উঠে যাও, অজু করো, ২ রাকাত তওবার নামাজ পড়ো।

মূলকথা গুনাহ হওয়া সমস্যা না। সমস্যা হলো গুনাহের উপর অটল থাকা। আল্লাহ বলেন:

— "আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেলে বা নিজের উপর জুলুম করে, তারা আল্লাহকে স্মরণ করে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করে? এবং তারা জেনে-শুনে তাদের কৃতকর্মের উপর অটল থাকে না" (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)

আজ থেকে নিয়ত করো: গুনাহ হবে, কিন্তু ১ মিনিটের বেশি আমি গুনাহগার থাকবো না। সাথে সাথে ইস্তেগফার করে নিবো ইন শা আল্লাহ।

সুন্নাতের উপর পাবন্দি;

"সুন্নাতের উপর পা বন্ধী" অর্থ হলো — রাসূল ﷺ এর দেখানো পথকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, দুনিয়ার ফিতনা, নিজের নাফস, আর মানুষের কথার সামনে সেটা ছেড়ে না দেওয়া।

আরবিতে বলে "আল-ইসতিকামাহ আলাস সুন্নাত"। এটাই সিরাতুল মুস্তাকিমে টিকে থাকার একমাত্র উপায়।

১. সুন্নাতের উপর পা বন্ধী কেন জরুরি?

কারণ ১: এটাই নাজাতের পথ;

রাসূল ﷺ বলেন: "আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা যতক্ষণ এ দুটো আঁকড়ে ধরবে, পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত" (মুয়াত্তা মালিক ১৫৯৪)

কারণ ২: শেষ জমানায় ফিতনা বাড়বে;

"আমার পরে এমন সময় আসবে যখন দ্বীনের উপর টিকে থাকা হাতে জ্বলন্ত কয়লা ধরে রাখার মতো হবে।" (তিরমিজি ২৬০)

তখনই বোঝা যাবে কার পা বন্ধী আর কার পা পিছলে যায়।

কারণ ৩: আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার উপায়;

"বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন" (সূরা আলে ইমরান: ৩১)

২. সুন্নাহ'র উপর পা বন্ধী মানে কী?

শুধু দাড়ি, টুপি না। এটা ৩টা লেভেলে হয়:

ক. আকীদার সুন্নাহ; আকীদার সুন্নাহ মানে হলো রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম যে আকীদা বা বিশ্বাস পোষণ করতেন, সেই একই আকীদা অন্তরে ধারণ করা। একে বলে আকীদায়ে সালাফিয়াহ বা আকীদায়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।

এটা ইসলামের ফাউন্ডেশন। ইবাদত, আখলাক সব এই আকীদার উপর দাঁড়িয়ে থাকে। ফাউন্ডেশন ভুল হলে পুরো বিন্ডিং ভেঙে পড়ে।

২. আকীদার সুন্নাহর ৩টা বৈশিষ্ট্য

সাহাবীদের আকীদা এই ৩টা জিনিসে ভরা ছিল:

ক. তাসলিম - বিনা শর্তে মেনে নেওয়া

আল্লাহ ও রাসূল ﷺ যা বলেছেন, "শুনলাম ও মানলাম"।

"কেন?", "কিভাবে?" বলে তর্ক না করা। যেমন আসমা ও সীফাতের ব্যাপারে।

খ. ইত্তিবা - অনুসরণ করা

নিজের আকল, যুক্তি, পীর-বুজুর্গের কথা উপর সুন্নাহকে প্রাধান্য দেওয়া।

ইমাম মালিক রহ. বলেন: _"প্রত্যেকের কথা গ্রহণও করা যায়, প্রত্যাখ্যানও করা যায়, শুধু এই কবরের অধিবাসী ﷺ ছাড়া"।

গ. ইজতিমা - জামাআতের সাথে থাকা,
উম্মাহ থেকে আলাদা হয়ে নতুন দল না বানানো।
রাসূল ﷺ বলেন: _"আমার উম্মত ৭৩ দলে ভাগ হবে। এক দল জান্নাতে যাবে। তারা হলো যারা আমার ও আমার সাহাবীদের পথে আছে"(আবু দাউদ ৪৫৯৭)

★যে জিনিসগুলো আকীদার সুন্নাহর খেলাফ;

এগুলো থেকে বাঁচা জরুরি:

ক.শিরক - আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দুয়া করা, সাহায্য চাওয়া, তাওয়াক্কুল করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

খ.বিদআত - দ্বীনের নামে নতুন কিছু আবিষ্কার করা। যেমন: মিলাদুন্নবীতে নতুন ইবাদত বানানো।

গ.তাতীল - আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করা।

ঘ. তামসিল - আল্লাহর সিফাতকে মাখলুকের সাথে তুলনা করা। "আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মতো"

ঙ. তাকফিরে বিলা হক- বিনা কারণে মুসলিমকে কাফির বলা

চ. খারেজী আকীদা- কবির গুনাহ করলেই কাফির হয়ে যায় মনে করা

★আকীদার সুন্নাহ কিভাবে ঠিক রাখবে?

সহীহ আকীদার কিতাব পড়া;

শুরু করো: _উসুলুস সুন্নাহ_ - ইমাম আহমদ, _আকীদাতুত তহাবিয়াহ_, _শারহুস সুন্নাহ_ - ইমাম বারবাহারী

সাহাবীদের জীবনী পড়া;

উনারাই বুঝেছে রাসূল ﷺ কে সঠিকভাবে। উনাদের আকীদা দেখলে ভুল হবে না।

আলেমদের জিজ্ঞাস করা;

যে আলেম কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবীদের বুকের দিকে ডাকে, তার কাছে যাও।

দোয়া করা

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ঈমানান লা ইয়ারতাদু"

হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এমন ঈমান চাই যা আর ফিরে আসবে না।

মূলকথা, আমল ভুল হলে তওবা করে ঠিক করা যায়।

কিন্তু আকীদা ভুল হলে আমল কবুলই হয় না।

আল্লাহ বলেন:

"যদি তুমি শিরক করো, তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে"

সূরা যুমার: ৬৫

তাই আকীদার সুন্নাহ হলো সবচেয়ে বড় নিয়ামত। এটাই তোমাকে ফিরকা, বিদআত, গোমরাহি থেকে বাঁচাবে। এছাড়া তাওহিদে কোনো শিরক না মেশানো, সাহাবীদের আকীদা লালন করা, নতুন কোনো বিদআতী আকীদা গ্রহণ না করা।

খ. ইবাদতের সুন্নাহ

- নামাজ, রোজা, যিকির রাসূল ﷺ যেভাবে করেছেন সেভাবে করবে

- "নিজের মতো করে একটু বাড়িয়ে নিই" — এটা করা যাবে না

- রাসূল ﷺ বলেন: _"যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার উম্মত নয়"
(সহীহ বুখারী ৫০৬৩)

গ. আখলাক ও মুআমালাতের সুন্নাহ;

- কথা বলা, ব্যবসা, বিচার, সংসার — সবখানে নবীওয়ালা আদর্শ

- রাসূল ﷺ ছিলেন "জীবন্ত কুরআন"।

৩. পা পিছলে যায় কেন?

সুন্নাহ'র উপর টিকে থাকা কঠিন হয় ৪টা কারণে:

১. মানুষের ঠাট্টা-বিদ্রূপ - "এখনও এগুলো মানো, তুমি খুব সেকেন্ডে স্টাইলের ইত্যাদি বলে বিদ্রূপ করা"
২. *দুনিয়ার লাভ-ক্ষতি* - সুন্নাহ মানলে চাকরি চলে যাবে, ক্লায়েন্ট হারাবে, হালাল ভাবে ব্যবসা করলে লোকসানের আশঙ্কা ইত্যাদি
৩. নফসের অলসতা - "আজ থাক, কাল থেকে শুরু করবো"
৪. *ইলমের অভাব* - কোনটা সুন্নাহ, কোনটা বিদআত সেটাই জানা নেই।

৪. সুন্নাহ'র উপর পাবন্দী রাখার ৫টি উপায়;

১. ইলম অর্জন করা;

জানবে না তো মানবে কী? রাসূল ﷺ কী করেছেন, কী বলেছেন, কী নিষেধ করেছেন — এগুলো জানতে হবে। ছোট শুরু করো: রিয়াদুস সালিহীন, হিসনুল মুসলিম পড়ো।

২. ছোট সুন্নাহ দিয়ে শুরু করা;

একবারে সব পারবে না। আজ থেকে ১টা সুন্নাহ ধরো:

- ডান হাতে খাওয়া
- মসজিদে ডান পা দিয়ে ঢোকা
- ঘুমের আগে আয়াতুল কুরসি পড়া

ছোট সুন্নাহগুলোই বড় সুন্নাহে টিকে থাকার শক্তি দেয়।

৩. নেককার দের সহোবত;

যারা সুন্নাহ মানো, তাদের সাথে চলো। একা থাকলে ১ সপ্তাহও টিকবে না। "সৎ সঙ্গী জান্নাতের পথে টানে"।

৪. মানুষের কথা গায়ে না মাখা;

রাসূল ﷺ কেও "পাগল", "জাদুকর" বলেছে। তোমাকে বললে অবাক হবে কেন? মনে রাখো: মানুষ খুশি হবে ২ দিন। আল্লাহ খুশি হলে চিরকাল।

৫. দোয়া করা

সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এই দোয়া পড়ো:

"আল্লাহুম্মা আরিনাল হাক্কান হাক্কান ওয়ারজুকনাত তিবাআহ, ওয়া আরিনাল বাতিলান বাতিলান ওয়ারজুকনাজ তিজতিনাবাহ"

অর্থ: হে আল্লাহ, সত্যকে সত্য দেখাও এবং তার অনুসরণ করার তাওফিক দাও। আর বাতিলকে বাতিল দেখাও এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দাও।

৫. সুন্নাহ'র উপর পাবলীর পুরস্কার;

রাসূল ﷺ বলেন:

_"যে আমার মৃত্যুর পর আমার সুন্নাহকে জীবিত করবে, সে আমাকে ভালোবাসলো।

আর যে আমাকে ভালোবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে"_

(তিরমিজি ২৬৭৮)

আর এক হাদিসে:

_"শেষ জমানায় আমার সুন্নাহ আঁকড়ে ধরনেওয়ালা ৫০ জন শহীদের সওয়াব পাবে"(আবু দাউদ ৪৩৪১)

দুনিয়া বদলে যাবে, ট্রেন্ড বদলে যাবে, মানুষের মত বদলে যাবে। কিন্তু সুন্নাহ বদলাবে না।

তাই পা বন্ধী রাখো। একা লাগলেও রাখো। কেউ বুঝুক না বুঝুক, রাখো। কারণ কিয়ামতের দিন রাসূল ﷺ জিজ্ঞাস করবেন না "তুমি কয়জনকে খুশি করেছো?" জিজ্ঞাস করবেন "তুমি আমার সুন্নাহ কতটুকু মানলে?"

নফল ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ;

নফল ইবাদত মানে ফরজ না, কিন্তু আল্লাহর কাছে প্রিয় এমন ইবাদত। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ফরজ। এর বাইরে যা করো সেটাই নফল—নফল নামাজ, নফল রোজা, নফল সাদাকা, বেশি বেশি যিকির। অনেকে বলে ফরজ তো পড়িই, নফল দিয়ে কী হবে? ব্যাপারটা এমন না। নফল হলো ফরজের বীমা, ঘাটতি পূরণের উপায়, আর আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার রাস্তা।

১. নফল আমল কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

১. ফরজের ঘাটতি পূরণ করে।

কিয়ামতে প্রথম হিসাব হবে নামাজের। ফরজ নামাজে ঘাটতি থাকলে আল্লাহ বলবেন: _"দেখো আমার বান্দার কোনো নফল নামাজ আছে কি না। যদি থাকে, তা দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূরণ করো।" (আবু দাউদ ৮৬৪)

আমাদের ফরজ নামাজে মনোযোগ কম, ভুল হয়, তাড়াহুড়া হয়। নফল নামাজ সেই ঘাটতি পূরণ করে।

২. আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার রাস্তা।

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন:

"আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে।" (সহীহ বুখারী ৬৫০২)

মানে নফল আমল করলে তোমার জীবনের গতি-পথ আল্লাহ নিজে কন্ট্রোল করেন। এর চেয়ে বড় কিছু আছে? সুবহানাল্লাহ!

৩. গুনাহ মোচন করে, মর্যাদা বাড়ায়;

রাসূল ﷺ বলেন: "অজু করে ২ রাকাত নামাজ পড়ো, মনোযোগ দিয়ে, তোমার আগের সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে" (সহীহ মুসলিম ২৬)

নফল রোজা জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের দূরত্ব তৈরি করে। (সহীহ মুসলিম ১৫৩)

৪. মৃত্যুর সময় কাজে আসে;

যে ব্যক্তি নফল আমলে অভ্যস্ত, মৃত্যুর সময় তার জবান সহজে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" উচ্চারিত হয়।

ফরজ শুধু করলে, নফল না করলে অন্তর শক্ত হয়ে যায়।

২. কোন নফল আমলগুলো সবচেয়ে লাভজনক;

ক. নফল নামাজ;

তাহাজ্জুদ: রাতের শেষ তৃতীয়াংশে ২ রাকাত নামাজ। এটা হলো নেককারদের অভ্যাস। (সূরা মুযযাম্মিল: ১-৪)

চাশতের নামাজ: সূর্য ওঠার ১৫ মিনিট পর থেকে জোহরের আগে। ২ রাকাত = ৩৬০ টি হারের সাদাকার সওয়াব। (মুসলিম ৭২০)

ফরজের আগে-পরের সুন্নাত: ফজরের ২, যোহরের ৪+২, মাগরিবের ২, ইশার সুন্নাত এগুলো না ছাড়া।

খ. নফল রোজা;

সোম ও বৃহস্পতিবার: রাসূল ﷺ এই দিন রোজা রাখতেন। (তিরমিজি ৭৪৭)

আইয়ামে বীজ: প্রতি আরবি মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ।

আশুরা, আরাফা: আরাফার রোজা ২ বছরের গুনাহ মোছে। মুসলিম ১৬২

গ. যিকির ও দোয়া;

১০ বার সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি: সাগরের ফেনার মতো গুনাহ মাফ হয়। (বুখারী ৬৪০)

সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন যিকির: এটা তোমাকে সারাদিন শয়তান থেকে বাঁচাবে।
ইস্তেগফার: দিনে ১০ বার "আস্তাগফিরুল্লাহ"। রিজিক বাড়ে, দুশ্চিন্তা কমে।

ঘ. নফল সাদাকা

১০ টাকা দিলেও নফল সাদাকা। গোপনে দিলে সবচেয়ে উত্তম। "গোপন সাদাকা আল্লাহর রাগ ঠাণ্ডা করে"(তাবারানি)

৩. নফল আমলের ৩টা নিয়ম;

ক. রিয়া থেকে বাঁচো: ফেসবুকে দেখানোর জন্য তাহাজ্জুদের ছবি দিলে সওয়াব শূন্য।
কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা।

খ. নিয়মিত করা: রাসূল ﷺ বলেন, _"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হয়"_ (মুসলিম ৭৮৩)

যেমন; ২ রাকাত তাহাজ্জুদ প্রতিদিন পড়া, ১০ রাকাত একদিন পড়ে ১০ দিন না পড়ার চেয়ে ভালো।

গ. ফরজ নষ্ট করে নফল না করা: ফজর কাযা করে তাহাজ্জুদ পড়লে লাভ নাই। আগে ফরজ, পরে নফল।

৪. ভুল ধারণা;

ভুল: "আমি তো গুনাহগার, নফল পড়ে কী হবে?"

সঠিক: নফলই তো গুনাহ মোচন করার উপায়। গুনাহগাররাই বেশি নফল করে তওবা করে।

ভুল: "সময় নাই"

সঠিক: ফোনে ৩০ মিনিট স্ক্রল করা যায়, কিন্তু ২ মিনিটে ১০ বার সুবহানালাহ পড়ার সময় হয় না। নফল ইবাদতে সময় লাগে না, নিয়ত লাগে।

ভুল: "নফল না করলেও চলবে"

সঠিক: চলবে, কিন্তু কিয়ামতে যখন ফরজে ঘাটতি ধরা পড়বে, তখন আফসোস করতে হবে।

মূলকথা, ফরজ হলো বেতন। নফল হলো ওভারটাইম। ওভারটাইম না করলে চাকরি থাকে, কিন্তু প্রমোশন হয় না। আল্লাহর কাছে প্রমোশন মানে হলো জান্নাতে উচ্চ মাকাম, আল্লাহর কুরবত, দুনিয়ায় বরকত।

আজ থেকে শুরু করো ৩টা দিয়ে:

1. ফজরের আগে ২ রাকাত সুন্নাত মিস করবে না
2. দিনে ১০ বার ইস্তেগফার
3. সপ্তাহে ১ দিন সোম বা বৃহস্পতিবার রোজা

নিয়মিত ৪০ দিন নফলের উপর অটল থাকলে দেখা যাবে অন্তর বদলে গেছে। ইন শা আল্লাহ।

সদাকায়ে জারিয়া ;

সদাকায়ে জারিয়া মানে "চলমান সাদাকা" — এমন দান যার সওয়াব তুমি মারা যাওয়ার পরেও কবরে পৌঁছাতে থাকবে। দুনিয়ার সব আমল মৃত্যুর সাথে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ৩টা জিনিস বন্ধ হয় না। রাসূল ﷺ বলেন:

— "মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, ৩টা জিনিস ছাড়া:

১. সদাকায়ে জারিয়া
২. এমন ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়
৩. নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে(সহীহ মুসলিম ১৬৩১)

এই ৩টাই সদাকায়ে জারিয়ার আওতায় পড়ে।

১. সদাকায়ে জারিয়ার বৈশিষ্ট্য

একবার খরচ, বারবার সওয়াব*: তুমি মরে গেলেও মানুষ যতদিন সেটা ব্যবহার করবে, ততদিন সওয়াব পাবে। নিজে উপস্থিত থাকতে হয় না*: তুমি কবরে, কিন্তু সওয়াব আসছে।

মৃত্যুর পর ইনভেস্টমেন্ট: দুনিয়ায় সবাই ক্যারিয়ার, টাকা জমায়। আর সদাকায়ে জারিয়া হলো আখিরাতের জন্য ইনভেস্টমেন্ট।

২. সদাকায়ে জারিয়ার উদাহরণ

ক. সাধারণ মানুষের জন্য সহজ উদাহরণ;

১. মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা বানানো বা তাতে সাহায্য করা।

রাসূল ﷺ বলেন: _"যে আল্লাহর জন্য মসজিদ বানায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর বানান"(সহীহ বুখারী ৪৫০)

২. টিউবওয়েল, পানির ব্যবস্থা করা;

সবচেয়ে উত্তম সাদাকা হলো পানি পান করানো।

সাহাবি সা'দ বিন উবাদা রা. রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাস করলেন, কোন সাদাকা উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন: _"পানি পান করানো" (আবু দাউদ ১৬৮৪)

৩. গাছ লাগানো;

_ "মুসলিম যে গাছ লাগায় বা ফসল বোনে, তা থেকে মানুষ, পাখি, পশু যা খায় তা তার জন্য সাদাকা হয়ে যায়" (সহীহ মুসলিম ১৫৩)

৪. কুরআন, ইসলামি বই দান করা;

যতজন পড়বে, আমল করবে, ততদিন তুমি সওয়াব পাবে।

৫. রাস্তা মেরামত, রাস্তায় ছায়ার ব্যবস্থা করা;
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানোও সাদাকা।

খ. ইলমের মাধ্যমে সাদাকায়ে জারিয়া;

১. দ্বীনের ইলম শিক্ষা দেওয়া*

তুমি কাউকে নামাজ শেখালে, সে যতদিন নামাজ পড়বে তুমি সওয়াব পাবে।

২. উপকারী ভিডিও, লেখা, পোস্ট শেয়ার করা;

এখনকার যুগে এটা সবচেয়ে বড় সুযোগ। একটা সহীহ দোয়া শেয়ার করলে লাখ মানুষ পড়তে পারে।

৩. ইসলামি অ্যাপ, ওয়েবসাইট বানানো;

কুরআন অ্যাপ, হাদিস অ্যাপ বানালে কোটি মানুষ উপকৃত হয়।

গ. সন্তানের মাধ্যমে সাদাকায়ে জারিয়া;

নেক সন্তানকে দ্বীন শেখাও, আদব শেখাও। সে তোমার জন্য দু'আ করবে, সাদাকা করবে।

এজন্যই সন্তান লালন-পালনও ইবাদত।

৩. সাদাকায়ে জারিয়া করার ৩টা নিয়ম

১. নিয়ত ঠিক রাখা - শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। নাম-যশের জন্য না।

২. হালাল টাকার মাধ্যমে সাদাকা করা - হারাম টাকায় সাদাকা কবুল হয় না।

৩. যা দীর্ঘস্থায়ী হয় সেটা বেছে নাও- একবার খেয়ে শেষ হয়ে যায় এমন জিনিসের চেয়ে যা থাকবে সেটা ভালো।

৪. মরে যাওয়ার আগে যা করে যাবে

জীবিত থাকতে করতে না পারলে অসিয়ত করে যাও।

রাসূল ﷺ বলেন: _"মুসলিমের জন্য জায়েয না, তার কাছে অসিয়ত করার মতো কিছু থাকলে, ২ রাত এমনভাবে কাটাতে যে তার অসিয়ত লিখিত না থাকে"_ (সহীহ বুখারী ২৭৩৮)

অনেকে মরার পর বলে "আমার টাকাটা মসজিদে দিয়ে দিও"। কিন্তু অসিয়ত না থাকলে ওয়ারিশরা নাও দিতে পারে।

৫. ছোট বাজেটে সদাকায়ে জারিয়া

"আমার তো টাকা নেই" — এটা অজুহাত না।

- ১০০ টাকায় একটা কুরআন দান করা যায়।
- ৫০ টাকায় গাছের চারা লাগাও।
- ফোনে সহীহ হাদিস শেয়ার করা যায়।
- কাউকে সূরা ফাতিহা শেখানো যায়।
- মসজিদের টিস্যু, জায়নামাজ কিনে দেওয়া।

ছোট হলেও নিয়ত বড় হলে আল্লাহ বড় করে দেন।

দুনিয়ায় তুমি যা বানাবে, সব পড়ে থাকবে।

কিন্তু তুমি যা আল্লাহর জন্য দিয়ে যাবে, সেটাই তোমার সাথে যাবে। কবরে গিয়ে তুমি বলবে না "আমার ফ্ল্যাটটা কোথায়?"

বলবে "আমার সাদাকা কোথায়?"

জবান ও অন্তরের পাথেয়;

জবানের পাথেয়; জবানের পাথেয় মানে হলো তোমার জিহ্বা দিয়ে এমন কথা বলা যা আখিরাতে তোমার জন্য সওয়াব, নূর আর মুক্তির কারণ হবে।

জবান ছোট অঙ্গ, কিন্তু এটাই জান্নাতেও নিয়ে যায়, জাহান্নামেও ফেলে দেয়।

রাসূল ﷺ বলেন: "মানুষ যা বলে তার কারণেই তো অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামে যাবে।"
(তিরমিজি ২৬১৬)

তাই জবানকে কাজে লাগাতে পারলে এটা হয় সবচেয়ে সহজ আর ভারী পাথেয়।

১. জবানের পাথেয় কী

ক. যিকির — সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে ভারী

যিকির মানে আল্লাহকে স্মরণ করা। এতে খরচ নাই, অজু লাগে না, সময় লাগে না।

- ৪ কালিমা: সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার।

এগুলো মিয়ানে ভারী। (মুসলিম ২৬৯৪)

- সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি: দিনে ১০ বার বললে সাগরের ফেনার মতো গুনাহ মাফ।

(বুখারী ৬৪০৫)

- লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ: জান্নাতের খাজানা। (বুখারী ৬৪০৯)

- সাইয়িদুল ইস্তেগফার: সকালে-সন্ধ্যায় পড়লে জান্নাত ওয়াজিব হয়। (বুখারী ৬৩০৬)

মজার ব্যাপার হলো—তুমি রাস্তায় হাঁটছো, রান্না করছো, গাড়ি চালাচ্ছে, তবুও যিকির করতে পারো। এটাই "চলমান পাথেয়"।

খ. কুরআন তিলাওয়াত;

প্রতি হরফে ১০ নেকি। আলিফ-লাম-মীম একসাথে ৩০ নেকি। *তিরমিজি ২৯১০*
১ পৃষ্ঠা পড়লেই ৩০+ নেকি। মরে গেলেও এই নেকি কবরে যাবে। যারা কুরআন পড়তে পারে না, তারা শুনলেও সওয়াব পায়।

গ. সত্য কথা ও সদুপদেশ;

"মুমিনের মুখ থেকে ভালো কথা ছাড়া কিছু বের হয় না" ভালো কথা সাদাকা। (বুখারী ২৯৮৯)

কাউকে একটা আয়াত, একটা হাদিস, একটা নসিহত শোনাতেও সেটা সদাকায় জারিয়া হয়।

ঘ. দু'আ;

দোয়া হলো ইবাদতের মগজ। (তিরমিজি ৩৭১)

নিজের জন্য, মা-বাবার জন্য, মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করো। জবানের দোয়া সরাসরি আরশে পৌঁছে।

ঙ. সালাম দেওয়া ও জবাব দেওয়া

সালাম ছড়িয়ে দেওয়া জান্নাতে নিয়ে যায়। (আবু দাউদ ৫১৯৭)

"আসালামু আলাইকুম" বললে ১০ নেকি, "ওয়া রহমাতুল্লাহ" যোগ করলে ২০, পুরোটা বললে ৩০।

২. জবান দিয়ে যা ধ্বংস হয়ে যায়

এগুলো থেকে বাঁচতে না পারলে বাকি সব পাথেয় নষ্ট:

ক. মিথ্যা: মিথ্যা ফুজুরের দিকে নিয়ে যায়, ফুজুর জাহান্নামে। (বুখারী ৬০৯৪)

খ. গীবত: মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমান। (সূরা হুজুরাত: ১২)

মানুষের পেছনে তার দোষ বলা গীবত, সত্য হলেও।

গ. চোগলখুরি: মানুষের মাঝে ঝগড়া লাগানো। এটা কবরের আজাবের কারণ। *বুখারী ৬০৫২*

ঘ. গালি-গালাজ, অভিশাপ: মুমিন অভিশাপ দেয় না। (তিরমিজি ১৯৭)

ঙ. অপ্রয়োজনীয় কথা: "মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো অপ্রয়োজনীয় কথা ছেড়ে দেওয়া" (তিরমিজি ২৩১৭)

রাসূল ﷺ বলেন: - "যে চুপ থাকে, সে নাজাত পায়" (তিরমিজি ২৫০১)

৩. জবানকে পাথেয় বাড়ানোর ৪টা কৌশল;

ক. চুপ থাকার অভ্যাস করা;

প্রয়োজন ছাড়া কথা বলো না। সাহাবিরা বলতেন: "চুপ থাকা হিকমতের দরজা"।

যখন কথা বলবে, তখন ভাববে: এটা বললে সওয়াব হবে নাকি গুনাহ?

খ. জবানকে যিকিরে ব্যস্ত রাখা;

যে জিহ্বা যিকিরে ব্যস্ত থাকে, সেটা গীবত-মিথ্যার জন্য ফাঁকা থাকে না। ফোন স্ক্রল করার সময়ও মনে "সুবহানাল্লাহ" বলো।

গ. কথা বলার আগে ৩টা প্রশ্ন করা;

- এটা কি সত্য?

- এটা কি দরকারি?

- এটা কি কারো উপকারে আসবে?

একটাও না হলে চুপ থাকো।

ঘ. সবসময় ইস্তেগফার করা;

জবান ফসকে গেলে সাথে "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলো।

আল্লাহ জবানের ভুল ক্ষমা করেন যদি তুমি ফিরে আসো।

৪. জবানের পাথেয়ের ফজিলত

- দুনিয়ায়: মন শান্ত থাকে, সম্পর্ক ভালো থাকে, বরকত বাড়ে।
- কবরে: যিকিরের নূর কবরকে আলোকিত করে।
- হাশরে: জবানের যিকির তোমার জন্য সুপারিশ করবে।
- জান্নাতে: যিকিরকারীর জন্য বিশেষ ঘর, বিশেষ নিয়ামত।

রাসূল ﷺ বলেন: "জান্নাতে একটা গাছ আছে। যিকিরকারী যখন 'সুবহানাল্লাহ' বলে, তার জন্য জান্নাতে একটা গাছ লাগানো হয়।" (তিরমিজি ৩৪৬৪)

সারকথা, টাকা-পয়সা দিয়ে পাথেয় জমাতে পারো না? সমস্যা নাই। জবান তো ফ্রি। এটা দিয়ে তুমি প্রতিদিন হাজার হাজার সওয়াব পাওয়ার যায়।

আজ থেকে শুরু করুন:

- দিনে ১০ বার "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি"
- গীবতের মজলিস থেকে উঠে যাওয়া
- কাউকে দেখলে আগে সালাম দেওয়া

জবান যদি ঠিক হয়, পুরো শরীর ঠিক হয়। রাসূল ﷺ বলেন: "যখন মানুষ সকালে ঘুম থেকে ওঠে, তখন সব অঙ্গ জিহ্বাকে বলে: আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আমরা তোমার সাথে আছি। তুমি ঠিক থাকলে আমরা ঠিক, তুমি বাঁকা হলে আমরা বাঁকা।" (তিরমিজি ২৪০৭)

অন্তরের পাথেয়;

অন্তরের পাথেয় মানে হলো অন্তরের ভেতর এমন অবস্থা তৈরি করা যা আখিরাতে তোমার নাজাত আর মর্যাদার কারণ হবে।

শরীরের আমল বাইরে দেখা যায়। অন্তরের আমল দেখা যায় না, কিন্তু আল্লাহ শুধু এটাই দেখেন।

রাসূল ﷺ বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা আর সম্পদের দিকে তাকান না। তিনি তাকান তোমাদের অন্তর আর আমলের দিকে।"(মুসলিম ২৫৬৪)

তাই অন্তর ঠিক না হলে ১০ বছর ইবাদত করেও লাভ নেই।

১. অন্তরের সবচেয়ে বড় পাথেয়: তাওহিদ ও তাকওয়া

ক. তাওহিদ - এক আল্লাহর উপর খাঁটি ঈমান

অন্তর থেকে বিশ্বাস করো আল্লাহ ছাড়া কেউ রিজিক দেয় না, কেউ উপকার-ক্ষতি করতে পারে না।

এই বিশ্বাস থাকলে তুমি শিরক, রিয়া, মানুষের ভয় থেকে মুক্ত হবে। তাওহিদ ছাড়া বাকি সব আমল ধূলার মতো। (সূরা যুমার: ৬৫)

খ. তাকওয়া - আল্লাহর ভয় আর ভালোবাসা;

তাকওয়া মানে: যেখানে আল্লাহ নিষেধ করেছেন সেখানে না যাওয়া, যেখানে আদেশ করেছেন সেখানে করা। আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সেই যে সবচেয়ে মুত্তাকী।"(সূরা হুজুরাত: ১৩)

তাকওয়া অন্তরে থাকলে দুনিয়ার লোভ, গুনাহ, অহংকার সব চলে যায়।

২. অন্তরের ৭টা গুরুত্বপূর্ণ পাথেয়

ক. ইখলাস - নিয়ত শুদ্ধ করা;

কাজ মানুষকে দেখানোর জন্য না, শুধু আল্লাহর জন্য করা। রিয়া থাকলে ৫০ বছর ইবাদতও বরবাদ।

রাসূল ﷺ বলেন: _"আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল"_ *বুখারী ১*

চেক করো: কেউ দেখলে বেশি ইবাদত করো? কেউ না দেখলে ছেড়ে দাও? তাহলে রিয়া আছে।

খ. ইনাবাহ - আল্লাহর দিকে ফিরে আসা;

গুনাহ হয়ে গেলে সাথে তওবা করা, দেরি না করা।

অন্তর কঠিন হয়ে যায় যখন তওবা দেরি হয়।

আল্লাহ বলেন: _"হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না"_ *সূরা যুমার: ৫৩*

গ. মুহাব্বাতুল্লাহ - আল্লাহকে ভালোবাসা;

দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসা।

এই ভালোবাসা থাকলে নামাজ ভারী লাগে না, কুরআন বিরক্ত লাগে না।

লক্ষণ: আল্লাহর নাম শুনলে অন্তর কাঁপে, আল্লাহর নিষেধ ভাঙতে ভয় লাগে।

ঘ. তাওয়াক্কুল - আল্লাহর উপর ভরসা করা;

চেষ্টা তুমি করবে, ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেবে। চাকরি না হলে, রিজিক কমলে অন্তর ভেঙে পড়বে না যদি তাওয়াক্কুল থাকে।

"যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট"(সূরা তালাক: ৩)

ঙ. শুকর - কৃতজ্ঞতা;

অল্প নিয়ামত পেলেও "আলহামদুলিল্লাহ" বলা।

শুকর করলে নিয়ামত বাড়ে।(সূরা ইবরাহিম: ৭)

অকৃতজ্ঞ অন্তর সবসময় অসুখী থাকে, হাজার পেলেও বলে "আরো চাই"।

চ. সবর - ধৈর্য;

বিপদে, গুনাহ না করার ক্ষেত্রে, ইবাদতে লেগে থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্য। সবরকারীর সাথে আল্লাহ থাকেন। (সূরা বাকারা: ১৫৩) ধৈর্যশীল অন্তর কখনো হতাশ হয় না।

ছ. কলবুন সালিম - হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত অন্তর;

কারো প্রতি ঘৃণা, হিংসা, অহংকার না রাখা।

রাসূল ﷺ বলেন, জান্নাতি হবে সেই যার অন্তর সালিম।

ঘুমানোর আগে বলো: "আল্লাহ, আজ যারা আমার সাথে খারাপ করেছে, আমি তাদের মাফ করে দিলাম"।

৩. অন্তর নষ্ট করে যে ৪টা রোগ;

এগুলো থাকলে বাইরের আমল দিয়ে কিছু হবে না:

ক.কিবর - অহংকার: "আমি ভালো, ও খারাপ" ভাব। এটা ইবলিশের রোগ। "যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে যাবে না।" (মুসলিম ৯১)

খ. হাসাদ - হিংসা: অন্যের নিয়ামত দেখে জ্বলা। এটা সব নেকি খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠ খায়। (আবু দাউদ ৪৯০৩)

গ. হুবুদ দুনিয়া - দুনিয়ার অতি মোহ: দুনিয়াই সব ভাবা, আখিরাত ভুলে যাওয়া। এটা সব ফিতনার মূল।

ঘ. যকাসাওয়াতুল কালব - অন্তরের কার্টিনা: কুরআন শুনেও চোখ ভেজে না, মৃত্যুর কথা মনে পড়ে না। বেশি গুনাহ, বেশি হাসি-ঠাট্টা, বেশি দুনিয়াদারি থেকে এটা হয়।

৪. অন্তরকে পাথেয় বানোর প্র্যাকটিক্যাল উপায়

ক. মুহাসাবাহ - নিজের হিসাব নেওয়া;

প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ৫ মিনিট ভাবো:

- আজ কী ভালো করলাম?
- কী খারাপ করলাম?
- কাল কী ভালো করবো?

উমর রা. বলতেন: "হিসাব নাও, হিসাব নেওয়ার আগে"।

খ. যিকির দিয়ে অন্তর নরম করা;

শুক্ক জমিতে পানি দিলে যেমন নরম হয়, শুক্ক অন্তরেও যিকির দিলে নরম হয়।

বিশেষ করে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর ইস্তেগফার।

গ. কুরআন দিয়ে অন্তর সারা;

কুরআনকে শুধু পড়ো না, বোঝো আর কাঁদো। "যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তবে তা ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যেত।" (সূরা হাশর: ২১)

আর আমাদের অন্তর পাথর হয়ে আছে!

ঘ. একাকী আল্লাহর সাথে সময় কাটানো;

তাহাজ্জুদে ২ মিনিট কেঁদে বলো: "আল্লাহ, আমি দুর্বল, আমাকে ঠিক করে দাও"। এই একাকী সময়ই অন্তরকে বাঁচায়।

৫. অন্তরের পাথরের ফল

-দুনিয়ায়: অন্তরে শান্তি, তৃপ্তি, টেনশন কম। "আল্লাহ আছেন" এই ভরসা সব দুশ্চিন্তা শেষ করে দেয়।

- মৃত্যুর সময়: সহজে কালিমা নসিব হয়।

- কবরে: নেককার অন্তর কবরকে জান্নাতের বাগান বানায়।

- কিয়ামতে: _"যেদিন ধন-সম্পদ আর সন্তান কোনো কাজে আসবে না, শুধু সেই উপকৃত হবে যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।" (সূরা শুআরা: ৮-৮৯)

মূলকথা, বাইরের লেবাস, দাড়ি, টুপি, বড় আমল—সব ঠিক থাকতে পারে। কিন্তু অন্তরে যদি হিংসা, অহংকার, রিয়া থাকে, তাহলে সব বরবাদ।

আর অন্তর যদি ঠিক থাকে, বাইরে ছোট আমলও আল্লাহর কাছে বিশাল হয়ে যায়।

আজ রাতে ঘুমানোর আগে নিজেকে জিজ্ঞাস করো:

"আমার অন্তরে এখন কী আছে? আল্লাহর ভালোবাসা, নাকি দুনিয়ার মোহ?"

যেটা নাই, সেটা চাও। আল্লাহ চাইলে ১ দিনেই অন্তর বদলে দেন।

অধিকহারে মৃত্যুর স্মরণ;

অধিকহারে মৃত্যুর স্মরণ মানে হলো—মৃত্যুকে ভুলে না যাওয়া, সবসময় মনে রাখা যে আমি যেকোনো সময় মরে যেতে পারি। এটা দুনিয়ার মোহ কাটানোর সবচেয়ে বড় ওষুধ। রাসূল ﷺ নিজেই বলেছেন এটা করতে।

১. কুরআন-হাদিসে মৃত্যুর স্মরণের নির্দেশ;

কুরআন বলে:

"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"(সূরা আলে ইমরান: ১৮৫)

"তুমি যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাকে পাকড়াও করবেই, যদিও তুমি সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।"(সূরা নিসা: ৭৮)

মৃত্যু থেকে পালানোর রাস্তা নাই। তাই এটা মনে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

হাদিস বলে:

রাসূল ﷺ বলেন: "সুখ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করো"(তিরমিজি ২৩০৭, নাসাঈ ১৮২৪, সহীহ হাদিস।)

আরেক হাদিসে বলেন:

"কবরের চেয়ে ভয়ংকর কোনো দৃশ্য আমি দেখিনি"(তিরমিজি ২৩০৮)

সাহাবিরা সবসময় মৃত্যু আর কবর নিয়ে কথা বলতেন। উমর রা. বলতেন: "যথেষ্ট তোমার জন্য উপদেশ হিসেবে মৃত্যু"।

২. কেন মৃত্যুর স্মরণ করতে হবে?

ক.দুনিয়ার মোহ কাটে;

মানুষ গুনাহ করে কারণ সে ভাবে "সময় আছে, পরে তওবা করবো"। মৃত্যু মনে রাখলে এই ধোঁকা কেটে যায়। আজই মরে গেলে কী হবে—এটা ভাবলে গুনাহ করার সাহস থাকে না।

খ.ইবাদতে আগ্রহ বাড়ে;

মৃত্যু মনে রাখলে নামাজে তাড়াছড়া করবে না, কুরআন পড়বে, যিকির করবে। কারণ তুমি জানো, এটাই হয়তো তোমার শেষ নামাজ।

গ.অহংকার আর হিংসা কমে;

যখন মনে পড়ে ২ মিটার মাটির নিচে সবাই সমান, তখন বড়াই করার কিছু থাকে না। ধনী-গরিব, সুন্দর-কুৎসিত—সব কবরেই একই।

ঘ. তওবা সহজ হয়;

গুনাহ হয়ে গেলে সাথে ফিরে আসো। "কাল তওবা করবো" এই দেরি থাকে না।

ঙ. দুনিয়ার দুশ্চিন্তা কমে;

চাকরি গেল, টাকা গেল, মানুষ কষ্ট দিল—মৃত্যু মনে পড়লে এগুলো ছোট মনে হয়। কারণ তুমি জানো, আসল ক্ষতি হলো বেনামাজি হয়ে মরা।

৩. কীভাবে মৃত্যুর স্মরণ করা যায়?

এটা মানে সারাদিন মুখ গোমড়া করে বসে থাকা না। বরং:

১. কবরস্থান জিয়ারত করা;

রাসূল ﷺ বলেছেন: _"আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন জিয়ারত করো। কারণ এটা আখিরাতকে স্মরণ করায়"(মুসলিম ৯৭) সপ্তাহে একবার গেলেই অন্তর নরম হয়।

২. মৃত্যুর কথা ভাবা;

দিনে ২-৩ মিনিট চোখ বন্ধ করে ভাবা:

- আজ যদি মারা যাই, আমি প্রস্তুত?
- কবরে আমাকে একা রাখা হবে, তখন কী জবাব দেব?
- কিয়ামতে কী মুখ নিয়ে দাঁড়াবো?

৩. জানাজার নামাজে যাওয়া;

অন্যের জানাজা দেখলে নিজের জানাজার কথা মনে পড়ে।

৪. মৃত্যু নিয়ে হাদিস পড়া

বুখারি-মুসলিমের "জানাইয" অধ্যায়, ইমাম গাজালির "মুহাসাবাতুন নাফস" পড়ো।

৫. *ঘুমানোর আগে মনে করো*

রাতে ঘুমানোর আগে ভাবো—এই ঘুম থেকে আর নাও জাগতে পারি।

তাই তওবা করে ঘুমাও।

৪. মৃত্যুর স্মরণের ৩টা ভুল পদ্ধতি

অতিরিক্ত করলে এটা হতাশা আর দুনিয়া ছেড়ে দেওয়ার দিকে নিয়ে যায়। ইসলাম এটা চায় না।

ভুল ১: সারাদিন কান্নাকাটি করে কাজ-কর্ম ছেড়ে দেওয়া।

সঠিক: মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখা, কিন্তু দুনিয়ায় দায়িত্ব পালন করা। রাসূল ﷺ সবচেয়ে বেশি মৃত্যু স্মরণ করতেন, তবুও তিনি রাষ্ট্র চালিয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন, ব্যবসা করেছেন।

ভুল ২: মৃত্যুর ভয়ে সবকিছু হারাম মনে করা।

সঠিক: হাল আনন্দ, পরিবার, খাওয়া-দাওয়া সবই সুন্নাহ। শুধু হারাম থেকে বাঁচো।

ভুল ৩: হতাশ হয়ে যাওয়া।

সঠিক: মৃত্যু স্মরণের উদ্দেশ্যে হতাশা না, বরং আমলে গতি আনা।

৫. মৃত্যুর স্মরণ করলে কী বদলায়?

আগে;

পরে;

নামাজে তাড়াহুড়া নামাজে খুশি বাড়ে

গীবত-মিথ্যা স্বাভাবিক জবান নিয়ন্ত্রণে আসে

দুনিয়ার জন্য পাগল আখিরাতের জন্য চিন্তা বাড়ে

গুনাহে লিপ্ত হলে সাথে সাথে তওবা করে

রাগ-অহংকার বেশি ক্ষমা করতে শেখে

ইবনু উমর রা. বলেন:

— "সন্ধ্যায় পৌঁছে সকালের অপেক্ষা করো না। সকালে পৌঁছে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। সুস্থতার সময় অসুস্থতার জন্য প্রস্তুতি নাও। জীবিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নাও" (বুখারী ৬৪১৬)

মূলকথা, মৃত্যুকে ভুলে থাকা হলো সবচেয়ে বড় ধোঁকা। কারণ মৃত্যু তোমাকে ভুলে নাই।

মৃত্যু স্মরণ মানে জীবনকে থামিয়ে দেওয়া না। মানে হলো—জীবনকে অর্থবহ করা। যে জানে সে যেকোনো সময় চলে যাবে, সে সময় নষ্ট করে না।

রাসূল ﷺ বলতেন:

_"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা আর অমুখাপেক্ষিতার"(মুসলিম ২৭২১) থেকে আল্লাহর আযাবের ভয় বা "খওফ" হলো ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। এটা মুমিনের অন্তরের এমন এক অবস্থা যা তাকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং আল্লাহর আনুগত্যে অটল রাখে।

১. খওফ কী এবং কেন জরুরি?

খওফ মানে আল্লাহর পাকড়াও, আযাব ও অসন্তুষ্টির ভয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"আর তোমরা আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও"।

রাসূল সা. বলেছেন: "জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়েছে কষ্টকর জিনিস দিয়ে, আর জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে কামনা-বাসনা দিয়ে"। ভয় না থাকলে মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে জাহান্নামের দিকে যায়।

ভারসাম্য: ইসলামে শুধু ভয় না, আশা-ভয় দুটোই লাগে। পাখির দুই ডানার মতো। শুধু ভয় থাকলে নিরাশ হয়ে যাবে, শুধু আশা থাকলে গুনাহে ডুবে যাবে। হাসান বসরী রহ. বলতেন: "মুমিন সকাল করে ভয়ের সাথে, বিকাল করে ভয়ের সাথে, অথচ সে নিরাপদ।"

২. কুরআনে আল্লাহর আযাবের বর্ণনা;

কবরের আযাব:

"আগুন, তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে উপস্থিত করা হয়"।

জাহান্নামের আযাব:

১. আগুন: نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"যে আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর"। দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি তাপ।

২. খাবার: যাক্কুম গাছ, যা গলিত তামার মতো পেটে ফুটতে থাকবে।

৩. পানীয়: গরম পানি যা নাড়িভুড়ি গলিয়ে দেবে, পুঁজ-রক্ত।

৪. পোশাক: আগুনের পোশাক, আলকাতরার জামা।

৫. স্থায়িত্ব: خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

"সেখানে তারা চিরকাল থাকবে"।

দুনিয়ার আযাব:

আদ, সামুদ, ফেরাউন, লুত আ. এর জাতি - অবাধ্যতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। এগুলো পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন।

৩. কাদের উপর আযাব আসে?

১. শিরককারী: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

"আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করেন না"।

২. কবীরা গুনাহে অটল: সুদ, যিনা, মিথ্যা, গীবত, বাবা-মায়ের অবাধ্যতা, এতিমের মাল খাওয়া।

৩. বান্দার হক নষ্টকারী: যুলুম, গালি, অপবাদ, টাকা মেরে দেওয়া। হাশরে নেকি দিয়ে শোধ করতে হবে।

৪. অহংকারী: রাসূল সা. বলেন: "যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না"।

৫. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ছেড়ে দেওয়া: সমাজে গুনাহ দেখেও চুপ থাকলে আযাব সবার উপর আসে।

৪. ভয় কেমন হওয়া উচিত?

প্রশংসনীয় ভয় ৩ স্তরের:

ক. ভয় যা ফরজ তরক থেকে বাঁচায়: নামাজ ছাড়া, যাকাত না দেওয়ার ভয়। এটা ফরজ।

খ. ভয় যা হারাম থেকে বাঁচায়: সুদ, যিনা, মদের ভয়। এটাও ফরজ।

গ. ভয় যা মাকরুহ ও সন্দেহযুক্ত কাজ থেকে বাঁচায়: এটা মুস্তাহাব, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সিফাত।

নিন্দনীয় ভয়: এত ভয় পাওয়া যে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া। *﴿تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ "আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না"।

আল্লাহ' র আযাবের ভয়

৫. আযাবের ভয় কীভাবে অর্জন করব?

ক. কুরআন তিলাওয়াত: জাহান্নামের আয়াতগুলো অর্থ বুঝে পড়ুন। সূরা গাশিয়া, ক্বারিয়াহ, হুমাযাহ।

খ. মৃত্যুকে স্মরণ: কবরস্থানে যান। রাসূল সা. বলেছেন: "কবরস্থান ঘিয়ারত করো, এটা আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেয়"।

গ. নিজের গুনাহ স্মরণ: দিন শেষে হিসাব করুন - আজ কী গুনাহ করলাম? আল্লাহ আমাকে দেখেছেন।

ঘ. আল্লাহর বড়ত্বের চিন্তা: আসমান-জমিন যার মুঠোয়, তিনি চাইলে এক সেকেণ্ডে পাকড়াও করতে পারেন।

ঙ. নেককারদের জীবনী পড়া: সাহাবীরা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েও কাঁদতেন। উমর রা. বলতেন: "হায়, যদি আমার মা আমাকে জন্মই না দিত"।

৬. ভয়ের ফলাফল কী?

গুনাহ ছেড়ে দেয়: চোখের যিনা, হাতের যিনা, মিথ্যা বন্ধ হয়।

ইবাদতে মনোযোগ: নামাজে খুশি আসে। *قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ * خَاشِعُونَ*

তওবায় তাড়াতাড়ি: গুনাহ হলেই ইস্তেগফার করে।

দুনিয়ার মোহ কমে*: বুঝে যায় এটা পরীক্ষার হল, থাকার জায়গা না। সে দুনিয়ার মোহে আকৃষ্ট হয় না।

জান্নাত লাভ: *وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ* "যে তার রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে তার জন্য দুটি জান্নাত"।

মূলত আল্লাহর আযাবের ভয় মানে হতাশ হওয়া না। বরং এটা সেফটি বেল্টের মতো - আপনাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে। রাসূল সা. দুআ করতেন: "হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে তোমার ভয় প্রার্থনা করি"।

আল্লাহ বলেন:

"আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর আমার আযাবই যন্ত্রণাদায়ক আযাব"।

তাই ভয় ও আশা দুটোই রাখুন। গুনাহ হলে তওবা করুন, আর নেক আমলে লেগে থাকুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর আযাব থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

সদা জান্নাতের প্রত্যাশা;

সদা জান্নাতের প্রত্যাশা; মানে হলো—দুনিয়ার জীবনে চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে সবসময় জান্নাতের আশা অন্তরে জাগ্রত রাখা। এটা মুমিনের অন্যতম গুণ।

যে জান্নাতের আশা করে না, সে দুনিয়াতেই আটকে যায়। আর যে জান্নাতের আশা করে, তার জন্য দুনিয়া জেলখানা মনে হয়।

রাসূল ﷺ বলেন: "দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা, আর কাফিরের জন্য জান্নাত"(মুসলিম ২৯৫৬)

১. কুরআন-হাদিসে জান্নাতের প্রত্যাশা

কুরআন বলে:

"তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা আর সেই জান্নাতের দিকে দৌড়াও, যার প্রশস্ততা আসমান-জমিনের সমান। তা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য"(সূরা;আলে ইমরান: ১৩৩)

আল্লাহ দৌড়াতে বলেছেন। হাঁটা না, দৌড়। মানে জান্নাতের জন্য সিরিয়াস হওয়া।

— "আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তিকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছে, নিশ্চয়ই জান্নাতই হবে তার ঠিকানা"।(সূরা নাজিয়াত: ৪০-৪১)

হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ৩ বার জান্নাত চায়, জান্নাত বলে: হে আল্লাহ, তাকে জান্নাতে ঢুকিয়ে দাও"

"আর যে জাহান্নাম থেকে ৩ বার পানাহ চায়, জাহান্নাম বলে: হে আল্লাহ, তাকে আমার থেকে বাঁচাও"(তিরমিজি ২৫৭২)

সাহাবিরা কীভাবে চাইতেন :

রবীআ ইবনে কাব রা. রাসূল ﷺ এর খেদমত করতেন। একদিন রাসূল ﷺ বললেন: "কিছু চাও"। তিনি বললেন: "জান্নাতে আপনার সঙ্গ চাই"(মুসলিম ৪৮৯)
দুনিয়া চাননি, টাকা চাননি। সোজা জান্নাত।

২. সদা জান্নাতের প্রত্যাশা কেন?

★গুনাহ থেকে বাঁচায়;

যখন মনে পড়ে "এই গুনাহ করলে জান্নাত মিস হয়ে যেতে পারে", তখন হাত-পা থেমে যায়।

ইউসুফ আ. কে জুলেখা ডাকলো। তিনি বললেন:

"আমি আল্লাহকে ভয় করি"(সূরা ইউসুফ: ২৩)

জান্নাতের আশা আর জাহান্নামের ভয় তাকে বাঁচিয়েছিল।

★ইবাদতে স্বাদ আনে;

নামাজ ভারী লাগে? ভাবো এই সিজদা জান্নাতের একটা ইট। রোজা কষ্ট? ভাবো এটা জান্নাতের রাইয়ান দরজার টিকিট। জান্নাতের লোভ থাকলে ইবাদত বোঝা মনে হয় না।

★দুনিয়ার কষ্ট সহজ হয়;

অসুখ, অভাব, অপমান—সব সহ্য হয় যখন মনে পড়ে: "জান্নাতে এসব থাকবে না"।

রাসূল ﷺ বলেন: _"দুনিয়ার সবচেয়ে কষ্টে থাকা জান্নাতি ব্যক্তিকে জান্নাতে একটা ডুব দেওয়ানো হবে। তারপর জিজ্ঞাস করা হবে: কখনো কষ্ট দেখেছো? সে বলবে: না আল্লাহর কসম, কখনো না।"(মুসলিম ২৮০৭)

এক ডুবেই সব কষ্ট ভুলে যাবে।

★মৃত্যুর ভয় কমে, শখ জাগে;

মুমিন মৃত্যুকে ভয় পায় না, কারণ সে জানে মৃত্যু মানে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ। উমর রা. বলতেন: "জান্নাত ছাড়া কোনো জিনিসের দিকে আমার চোখ যায় না"।

৩. জান্নাতের প্রত্যাশা কীভাবে অন্তরে জাগিয়ে রাখা যায়?

★জান্নাতের বর্ণনা পড়ো ও কল্পনা করো*

কুরআনের সূরা ওয়াকিয়া, সূরা রহমান, সূরা ইনসানে জান্নাতের বর্ণনা দেওয়া আছে।

- জান্নাতে দুঃখ নাই, ক্লান্তি নাই।(সূরা ফাতির: ৩৫)
- যা চাইবে তাই পাবে।(সূরা ফুসসিলাত: ৩১)
- ৩০ বছরের যুবক/যুবতী হয়ে থাকবে, আর বুড়া হবে না (তিরমিজি ২৫৪৫)
- আল্লাহ নিজে সালাম দেবেন (সূরা ইয়াসিন: ৫৮)
- সবচেয়ে বড় নিয়ামত: আল্লাহকে দেখবে (সূরা কিয়ামাহ: ২২-২৩)

দিনে ৫ মিনিট চোখ বন্ধ করে ভাবা: আমি জান্নাতের বাগানে হাঁটছি, আমার মা-বাবা পাশে, কোনো টেনশন নাই।

★জান্নাত চেয়ে দু'য়া করা;

রাসূল ﷺ শিখিয়েছেন: "আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল জান্নাহ, ওয়া আউজুবিকা মিনান্নার"

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই, জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।

এটা দিনে ৩ বার বললে জান্নাত নিজেই তোমার জন্য দুয়া করবে।

আরো অন্যান্য দুআ আছে। যেমন: "আল্লাহুম্মা আদখিলনিল জান্নাতা বিগাইরি হিসাব।" হে আল্লাহ, বিনা হিসাবে আমাকে জান্নাতে দিও।

★জান্নাত ওয়াজিব করে এমন আমল করা;

- তাওহিদ: শিরক থেকে বাঁচো।"যে শিরক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে যাবে"_ (বুখারী ৪৪)
- ওয়াক্ত নামাজ*:"যে ৫ ওয়াক্ত নামাজ গুরুত্ব দিয়ে পড়বে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেবেন"(আবু দাউদ ৪৩০)
- রোজা: রাইয়ান নামে দরজা দিয়ে শুধু রোজাদার ঢুকবে (বুখারী;১৮৯৬)
- সচ্চরিত্র:"মিয়ানে সবচেয়ে ভারী হবে সুন্দর চরিত্র।" (আবু দাউদ ৪৭৯৯)

- ইয়াতিমের দায়িত্ব: _"আমি আর ইয়াতিমের দায়িত্ব নেওয়া ব্যক্তি জান্নাতে এভাবে থাকবো" দুই আঙুল মিলিয়ে দেখালেন (বুখারী ৫৩০৪)

★ মৃত্যুকে স্মরণ করা;

মৃত্যু মনে রাখলে জান্নাতের কথা এমনিই মনে পড়ে। কারণ মৃত্যুর পর হয় জান্নাত, না হয় জাহান্নাম।

৪. জান্নাতের প্রত্যাশা নিয়ে ২টা ভুল ধারণা;

ভুল ১: "আমি তো গুনাহগার, আমার দ্বারা জান্নাত হবে না"

সঠিক: আল্লাহর রহমত তোমার গুনাহ থেকে বড়। একজন পতিতা নারী কুকুরকে পানি খাওয়াইয়া জান্নাতে গেছে (বুখারী ৩৩২১)। তুমি নিরাশ হবে কেন?

ভুল ২: "জান্নাতের আশা করলে আমল কমে যায়"

সঠিক: সাহাবিরাজ জান্নাতের আশায়ই রাত জাগতেন, যুদ্ধে জীবন দিতেন। আশা না থাকলে চেষ্টা আসে না।

তবে শুধু আশা না, ভয়ও রাখতে হবে। আশা আর ভয় পাখির দুই ডানার মতো। একটা না থাকলে উড়তে পারবে না।

৫. সদা জান্নাতের প্রত্যাশার ফলাফল;

★ দুনিয়ায়: অন্তরে শান্তি। টাকা-পয়সা না থাকলেও মনে হয় "আমার আসল বাড়ি তো জান্নাত"।

★ মৃত্যুর সময়: ফেরেশতা এসে বলে:"হে প্রশান্ত আত্মা, তোমার রবের দিকে ফিরে যাও সন্তুষ্ট হয়ে। আমার বান্দাদের দলে शामिल হও, আমার জান্নাতে প্রবেশ করো" (সূরা ফাজর: ২৭-৩০)

★ কবরে: জান্নাতের জানালা খুলে দেওয়া হয়।

★ হাশরে: আরশের ছায়াতে আশ্রয় দিবেন। ইন শা আল্লাহ।

মূলত: দুনিয়া হলো পরীক্ষার হল। জান্নাত হলো রেজাল্ট। যে ছাত্র রেজাল্টের কথা ভাবে, সে পরীক্ষায় ফাঁকি দেয় না।

তাই ঘুম থেকে উঠে বলো: "ইয়া আল্লাহ, আজকের দিনটা জান্নাতের কাজে লাগাও"।
ঘুমাতে যাওয়ার আগে বলো: "ইয়া আল্লাহ, জান্নাত না দিয়ে মৃত্যু দিও না"।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

_"তোমরা জান্নাতের জন্য কাজ করো, কারণ জান্নাতের জন্য কাজ করা সহজ করা হয়েছে"(বুখারী ৪৯৪৯)

জান্নাত সস্তা না, কিন্তু আল্লাহর রহমতে তোমার জন্য সহজ হতে পারে ইন শা আল্লাহ।
শুধু চাইতে থাকো, কাজ করতে থাকো।

প্র্যাকটিক্যাল: আজ থেকে প্রতি নামাজের পর এই দুআ পড়ার অভ্যাস করো;
"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা রিদাকা ওয়াল জান্নাহ, ওয়া আউজুবিকা মিন সাখাতিকা ওয়ান্নার।"

অর্থ; হে আল্লাহ, আমি আপনার সন্তুষ্টি আর জান্নাত চাই, আপনার অসন্তুষ্টি আর জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।

১ মাস আমল করলে দেখা যাবে অন্তরের অবস্থা বদলে গেছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ফিরদাউস দান করুন। আমিন।

রবের দিদার লাভের আকাঙ্ক্ষা;

রবের দিদার মানে হলো কিয়ামতের দিন জান্নাতে আল্লাহ তাআলাকে নিজের চোখে দেখা। এটা জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত। জান্নাতের হ্র, বাগান, নদী, প্রাসাদ সবকিছু এক পাশে রাখলেও আল্লাহর দিদারের কাছে সব তুচ্ছ। রবের দিদারের আকাঙ্ক্ষা মুমিনের অন্তরের সবচেয়ে দামি সম্পদ।

কুরআন-হাদিসে রবের দিদারের প্রমাণে কুরআন বলে: "সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"(সূরা কিয়ামাহ: ২২-২৩)

এই আয়াত একদম স্পষ্ট। জান্নাতিরা আল্লাহকে দেখবে।

"যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান আর আরও অতিরিক্ত।"(সূরা ইউনুস: ২৬)

রাসূল ﷺ বলেন: "উত্তম প্রতিদান মানে জান্নাত, আর অতিরিক্ত মানে আল্লাহর চেহারা দেখা।" (মুসলিম ১৮১)

"সতর্কতা অবলম্বনকারীরা থাকবে জান্নাতে ও নহরে। সত্যের আসনে, সর্বশক্তিমান বাদশাহর নিকটে।" (সূরা কামার: ৫৪-৫৫)

হাদিস বলে:

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন: আমরা রাসূল ﷺ এর কাছে ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন:

"তোমরা তোমাদের রবকে এভাবে স্পষ্ট দেখতে পাবে, যেমন এই চাঁদকে দেখছো। দেখতে তোমাদের কোনো ভিড় ঠেলাঠেলি হবে না।"(বুখারী ৫৫৪, মুসলিম ৬৩৩)

রাসূল ﷺ আরও বলেন:

"জান্নাতিরা যখন জান্নাতে ঢুকবে, আল্লাহ বলবেন: তোমরা কি আরও কিছু চাও? তারা বলবে: আপনি কি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেননি? জান্নাতে দেননি? জাহান্নাম থেকে

বাঁচাননি? তখন আল্লাহ পর্দা সরিয়ে দেবেন। তাদের কাছে আল্লাহকে দেখার চেয়ে প্রিয় আর কিছু থাকবে না।"(মুসলিম ১৮১)

সুবহানাল্লাহ! জান্নাত পেয়েও তারা আরও কিছু চাইবে। আর সেটা হলো আল্লাহর দিদার।

★ কেন রবের দিদারের আকাঙ্ক্ষা?

ক. এটাই সর্বোচ্চ সফলতা;

দুনিয়ার সব সফলতা মৃত্যুর সাথে শেষ। জান্নাত পেলেও দিদার না পেলে অপূর্ণতা থেকে যায়।

মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বলেছিলেন: "হে আমার রব, আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখবো।"(সূরা আরাফ: ১৪৩)

নবী হয়েও তিনি দিদার চেয়েছেন। আমরা চাইবো না কেন?

খ. দুনিয়ার কষ্ট তুচ্ছ মনে হয়;

যে জানে একদিন আল্লাহকে দেখবে, তার কাছে দুনিয়ার অপমান, অভাব, অসুখ কিছুই না।

কারণ সে জানে: "আমার রব আমাকে দেখা দেবেন"—এই আশা সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।

গ. ইবাদতে প্রাণ আসে;

নামাজে দাঁড়ালে মনে হয়: "আমি যার সাথে দেখা করার জন্য পাগল, তার সামনেই দাঁড়িয়েছি"।

এই আকাঙ্ক্ষা থাকলে নামাজে খুশি আসবে, চোখে পানি আসবে। ইন শা আল্লাহ।

ঘ. গুনাহ থেকে বাঁচায়;

যে আল্লাহকে দেখতে চায়, সে আল্লাহকে নারাজ করতে ভয় পায়।

ভেবে দেখুন: আমি যদি গুনাহ করি, তাহলে কি আল্লাহ তাআলা সেদিন আমার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন?

★কারা আল্লাহর দিদার পাবেন?

আল্লাহ সবাইকে দেখা দেবেন না।

"কখনো না, সেদিন তারা তাদের রব থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে।"(সূরা মুতাফফিফিন: ১৫)

এটা কাফিরদের শাস্তি।

দিদার পাবেন যারা:

১। খাঁটি তাওহিদবাদী: জীবনে শিরক করেনি। (বুখারী ৪৪)

২। ইহসানের সাথে ইবাদতকারী: এমনভাবে ইবাদত করে যেন আল্লাহকে দেখছে। না দেখলেও বিশ্বাস করে আমাকে আল্লাহ দেখছেন। (মুসলিম ৮)

৩। ফজর ও আসরের নামাজ হেফাজতকারী: রাসূল ﷺ চাঁদের হাদিস বলার আগে বলেছেন: "তোমরা যদি ফজর ও আসর না ছাড়ো, তাহলে আল্লাহকে দেখতে পাবে।" (বুখারী ৫৫৪)

৪। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষী: যে আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন।"(বুখারী ৬৫০৭)

★রবের দিদার লাভের জন্য কিছু আমল;

★দুআ করা;

এটা সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। রাসূল ﷺ দুআ করতেন:

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা লাজ্জাতান নাজরি ইলা ওয়াজহিকা, ওয়াশ শাওকা ইলা লিকাইক।"

হে আল্লাহ, আমি তোমার চেহারার দিকে তাকানোর স্বাদ চাই, তোমার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ চাই। (নাসাঈ ১৩০৫)

আরেকটা দুআ: _"আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনি লাজ্জাতান নাজরি ইলা ওয়াজহিক।"
হে আল্লাহ, তোমার চেহারা দেখার স্বাদ থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

★নামাজ সুন্দর করা;

ফজর আর আসর জামাতে পড়ো। নামাজে মনে করা: "আমি আল্লাহর সামনে। তিনি আমাকে দেখছেন"। যে দুনিয়াতে আল্লাহকে না দেখে সিজদা দেয়, আল্লাহ তাকে আখিরাতে দেখা দেবেন।

★গুনাহ থেকে চোখ-কান বাঁচানো;

হারাম দেখা, হারাম শোনা অন্তরকে কালো করে। কালো অন্তর আল্লাহকে দেখতে পাবে না।

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন: "যে দুনিয়াতে চোখের হেফাজত করে, আখিরাতে আল্লাহ তাকে দিদার দেবেন"। ইন শা আল্লাহ তাআলা।

★ রাতে একা আল্লাহর সাথে সময় কাটানো;

তাহাজ্জুদে উঠে কেঁদে কেঁদে বলা "ইয়া আল্লাহ, আমি তোমাকে দেখতে চাই"। যে রাতের অন্ধকারে আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ তাকে হাশরের আলোতে দেখা দিবেন ইন শা আল্লাহ।

★দুনিয়ার মোহ কমানো;

দুনিয়াকে অন্তরে জায়গা দিলে আল্লাহর মহব্বত ঢুকবে না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন: "দুনিয়া হলো মৃত জানোয়ার। এটা খায় কুকুর। আর আল্লাহর দিদার চায় সিংহ"।

★ রবের দিদারের প্রশান্তি;

রাসূল ﷺ বলেন: জান্নাতিরা আল্লাহকে দেখার পর ৪০ বছর মোহগ্রস্ত থাকবে। জান্নাতের নিয়ামত ভুলে যাবে। *তিরমিজি ২৫৫২*

ইমাম মালিক রহ. কে জিজ্ঞাস করা হলো: আল্লাহকে দেখা যাবে? তিনি কেঁদে বললেন: "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম। চোখ দিয়ে দেখবে। যদি মুমিনরা তাদের রবকে না দেখে, তাহলে তারা দুঃখে মরে যাবে"।

ভাবুন: যাকে না দেখে ভালোবাসলেন, যার জন্য কাঁদলেন, যার আদেশ মানতে গিয়ে কষ্ট করলেন—সেই রব সামনে। তিনি হাসছেন। বলছেন: _"হে আমার বান্দা, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট, আর কখনো নারাজ হবো না।"(বুখারী ৬৫৪৯)
এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু হতে পারে?

দুনিয়ার সব প্রেম, সব সৌন্দর্য, সব আনন্দ সবই নকল। আসল জিনিস সামনে।

তাই সাহাবিরা বলতেন:"আমাদের দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে শুধু আল্লাহর দিদারের যোগ্য হওয়ার জন্য।"

আজ থেকে প্রতি সিজদায় বলুন: "ইয়া আল্লাহ, তোমাকে দেখার তৌফিক দিও"।

ঘুমানোর আগে ভাবুন: "একদিন আমি আমার রবকে দেখবো"।

এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মরতে পারলে জীবন সফল।

পাশাপাশি দুআ করতে পারি: আল্লাহুমা মাতি'না বিলাজ্জাতিন নাজরি ইলা ওয়াজহিকাল কারীম।

অর্থ; হে আল্লাহ, তোমার সম্মানিত চেহারা দেখার স্বাদ দিয়ে আমাদের ধন্য করুন। আমিন।

দৈনন্দিন ইসলামিক জীবন;

দৈনন্দিন ইসলামিক জীবন হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণে পরিচালিত একটি সুশৃঙ্খল, পরিমিত ও কল্যাণকর জীবনধারা। এর মূল ভিত্তি হলো ইবাদত, হালাল উপার্জন, উত্তম চরিত্র গঠন এবং মানবতার সেবা। দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নিচে দেওয়া হলো:

দৈনন্দিন ইবাদত: দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ জামাতে আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা। এ ছাড়া নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও সকাল-সন্ধ্যার দোয়া পাঠের মাধ্যমে আত্মিক প্রশান্তি লাভ করা যায়।

হালাল রিজিক: সততার সাথে হালাল উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা ইবাদতের অংশ। লেনদেনে সততা, ইনসাফ বজায় রাখা এবং প্রতারণা থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরি।

উত্তম চরিত্র: সবসময় সত্য কথা বলা এবং গিবত, পরনিন্দা ও মিথ্যা থেকে দূরে থাকা। রাগ নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমা প্রদর্শন এবং বিনয়ী হওয়া একজন মুসলিমের অন্যতম গুণ।

পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব: পিতা-মাতার সেবা, স্ত্রীর হক আদায় এবং সন্তানদের সঠিক ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেওয়া এবং সমাজের দুর্বল ও অসহায়দের সাহায্য করা।

স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা: ইসলামে পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। ঘুমানোর ও ঘুম থেকে ওঠার সুন্নাহ, খাওয়া-দাওয়ার ইসলামিক আদব এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য পরিমিত আহার করা।

বিস্তারিত ভাবে বলতে দৈনন্দিন ইসলামিক জীবন মানে হলো ঘুম থেকে উঠা থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে কাটানো। ইসলাম শুধু মসজিদের না, ওয়াশরুম থেকে ব্যবসা বাণিজ্য পর্যন্ত সবকিছুর নিয়ম দিয়েছে। যে

জীবন রাসূল ﷺ যাপন করেছেন, সেটাই বেস্ট লাইফস্টাইল। নিচে আলোচনা করা হলো:

ঘুম থেকে উঠা থেকে সকাল পর্যন্ত;

১। ঘুম থেকে উঠে দু'আ পড়া;

"আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর"

অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মৃত্যুর পর আমাদের জীবিত করলেন। (বুখারী ৬৩১২)

ঘুম ছোট মৃত্যু। তাই জেগে শুকরিয়া আদায় করতে হয়।

২. মিসওয়াক + অজু করা: রাসূল ﷺ ঘুম থেকে উঠেই মিসওয়াক করতেন। (বুখারী ২৪৫)। মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, আল্লাহ খুশি হন।

৩. তাহাজ্জুদ: পারলে ফজরের ২০-৩০ মিনিট আগে উঠে ২ রাকাত হলেও পড়া। এটা আল্লাহর সাথে একান্ত সময়। "রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন" (বুখারী ১১৪৫)

ফজর:

১. আজানের জবাব + দু'আ পড়া: আজান শুনে আজানের জবাব দাও, দরুদ পড়া, তারপর দু'আ করা। এই সময় দু'আ ফেরত যায় না। এই সময়কে ইকামতের সময় বলা হয়।

২. সুন্নাত ২ রাকাত: রাসূল ﷺ বলেন: _"ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম।" (মুসলিম ৭২৫) রাসূল ﷺ ফজরের দুই রাকাত সুন্নতে সূরা কাফিরুন আর সূরা ইখলাস পাঠ করতেন।

৩. ফরজ জামাআতে: পুরুষ মসজিদে, নারী ঘরে আউয়াল ওয়াক্তে। "ফজর জামাআতে পড়লে সারারাত ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়।" (মুসলিম ৬৫৬)

৪. ফজরের পর জিকির: সূর্য উঠা পর্যন্ত নামাজের স্থানে বসে থাকা। সুবহানাল্লাহ ৩৩, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩, আল্লাহু আকবার ৩৪। আয়াতুল কুরসি, ৩ কুল। তারপর ইশরাকের ২ রাকাত পড়া। এতে করে হজ্ব ও উমরার সওয়াব লাভ করা যায়।(তিরমিজি:৫৮৬)

দিনের বেলা: কাজ-কর্ম + ইবাদত:

সকাল-দুপুর:

১. হালাল রিজিক: কাজে যাওয়ার সময় দু'আ পড়া: "বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আল্লাল্লাহ।"ব্যবসা-চাকরি সব ইবাদত যদি নিয়ত ঠিক থাকে। রাসূল ﷺ বলেন: "হালাল রুজির সন্ধান করা ফরজ।"(বাইহাকি)

২. চোখের হেফাজত: রাস্তায়, মোবাইলে হারাম দেখা থেকে বেঁচে থাকা। "চোখের জিনা হলো দেখা।"(বুখারী ৬২৪৩)। রবের দিদার চাইলে দৃষ্টির গলদ ব্যবহার থেকে বাঁচতে হবে।

৩. জবানের হেফাজত: গীবত, মিথ্যা, গালি না।"যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।"(তিরমিজি ২৫০১) বেশি বেশি জিকির: সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, হাসবুন আল্লাহি অনিমালা ওয়াকিল, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

৪. যোহর + আসর: আউয়াল ওয়াক্তে পড়া। যোহরের আগে ৪ পরে ২ সুন্নাত, আসরের আগে ৪ সুন্নাত। কাজের ফাঁকে নামাজ—এটাই তাকওয়া।

বিকাল-সন্ধ্যা:

১. আসরের পর: এই সময় দুয়া কবুল হয়, বিশেষ করে শুক্রবার। কুরআন তিলাওয়াত করা। দিনে ১ পৃষ্ঠা হলেও।

২. মাগরিব: সূর্য ডুবার সাথে সাথে পড়া। দেরি না করা। মাগরিবের পর ২ রাকাত সুন্নাত + আওয়াবিন ৬ রাকাত পড়লে ১২ বছরের ইবাদতের সওয়াব।

৩. পরিবারকে সময়: রাসূল ﷺ ঘরে ঢুকে সালাম দিতেন, স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করতেন। (বুখারী ৬৭৬) সন্তানদের দ্বীন শেখানো, ঘরোয়া তালিম করা। এগুলোও ইবাদত।

৪. এশা: এশার আগে ঘুমানো মাকরুহ। এশা জামাআতে পড়লে অর্ধেক রাত ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়। (মুসলিম ৬৫৬) এশার পর অযথা কথা বার্তা রাসূল ﷺ অপছন্দ করতেন। তাই অনর্থক সময় নষ্ট না করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাওয়া।

রাতের আমল + ঘুম:

১. সূরা মূলক: এই সূরা কবরের আজাব থেকে বাঁচাবে ইন শা আল্লাহ। (তিরমিজি ২৮৯১) ঘুমের আগে সূরা মূলক তিলাওয়াত করা।

২. অজু করে ঘুমানো: "অজু করে ঘুমালে একজন ফেরেশতা সারারাত দু'আ করে: হে আল্লাহ, একে মাফ করো।" (ইবনে হিব্বান)

৩. *ঘুমানোর আগে দু'আ পড়া: ডান কাতে শুয়ে, চোয়ালের নিচে হাত রাখা সুন্নত। এবং আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া পড়া। (বুখারী ৬৩২৪) আয়াতুল কুরসি, ৩ কুল পড়ে শরীর মাসেহ করা।

৪. তওবা: নিজের হিসেব নিজে নেওয়াকে আরবিতে মুহাসাবা অর্থাৎ আত্মপর্যালোচনা বা আত্মসমালোচনা বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন মানুষ তার দৈনন্দিন ভালো-মন্দ কাজ, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দায়িত্ব-কর্তব্যের হিসাব নিয়ে নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করে। গুনাহ হয়ে গেলে ইস্তেগফার করা, কারো আচরণে কষ্ট পাইলে ক্ষমা করে ঘুমানো। মনে মনে ধিয়ান করা এটাই হয়তো শেষ ঘুম। এই

৪. সারাদিনের ১০টা সুন্নাত অভ্যাস:

ঘরে ঢুকে সালাম দেওয়া এতে শয়তান ঘরে ঢুকতে পারে না।(মুসলিম ২০১৮)

খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ পড়া এতে বরকত হয়।

খাওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বললে আল্লাহ খুশি হন (মুসলিম ২৭৩৪)

বাথরুমে প্রবেশের সময় দু'আ পড়া, বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা এতে করে জ্বিন থেকে হেফাজত থাকা যায়।

বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বের হওয়া এবং গুফরানাকা.... দু'আ পড়া।

ডান দিক থেকে কাপড় পরিধান করা এবং দু'আ পড়া

হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ পড়া এবং অপর ভাই ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে।

ডান দিক দিয়ে রাস্তায় হাঁটা।

কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা সদকা (বুখারী ২৯৮৯)

মুসলিম কোনো ভাইয়ের সাথে দেখা হলে মুসাফাহা করা এবং মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলা। এতে গুনাহ ঝরে যায়। (আবু দাউদ ৫২১২)

রাতে বাতি নিভানো সময় বিসমিল্লাহ বলা তাহলে শয়তান জ্বালাতে পারবে না। (বুখারী ৩২৮০)

৫. অন্তর ঠিক রাখার ৪ কাজ

১. মৃত্যু স্মরণ: দিনে অন্তত ১ বার হলেও ভাবা যদি আজ আমি মারা যাই। তাহলে আমার জায়গা কোথায় হবে? জান্নাত না জাহান্নাম? এভাবে ফিকির করলে গুনাহ কমে যাবে। ইন শা আল্লাহ।

২. জান্নাতের আশা: কষ্টের সময় জান্নাতের কথা স্মরণ করা। জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত রাজির কথা ভাবলে দুনিয়ার দুঃখ- কষ্ট তুচ্ছ মনে হবে এবং সবর আসবে। ইন শা আল্লাহ।

৩. আল্লাহর জিকির: জিহ্বা ভিজা রাখতে হবে জিকিরে। এতে করে দুনিয়াবি পেরেশানি কমে যাবে। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সর্বোত্তম জিকির।

৪. মানুষের হক: কারো হক নষ্ট করলে রাতে ঘুমানোর আগে মাফ চেয়ে নেওয়া। আল্লাহ নিজের হক মাফ করেন, বান্দার হক না।

মূলত ইসলামিক জীবন মানে শুধু দাড়ি-টুপি না, বরং ২৪ ঘণ্টা আল্লাহকে স্মরণে রাখা।

রাসূল ﷺ বলেন: _"আমার সব উম্মত জান্নাতে যাবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে সে না"_। জিজ্ঞাস করা হলো: কে অস্বীকার করে? বললেন: _"যে আমার আনুগত্য করলো সে জান্নাতে গেলো, যে অবাধ্য হলো সে অস্বীকার করলো।"(বুখারী ৭২৮০)

তাই ছোট ছোট সুন্নাত দিয়ে শুরু করো। একদিনে সব পারবে না।

১. আজ থেকে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আউয়াল ওয়াত্তে।
২. কাল থেকে মিসওয়াক।
৩. পরশু থেকে ঘুমের দুআ।

এভাবে একটা একটা করে অভ্যাস করা। ১ বছর পর দেখা যাবে নিজের মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা নিকট প্রচুর দুআ করা, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য গোপনে এবং প্রকাশ্যে দান-সদাকা করা।

আল্লাহুমা আ'ইন্বি আলা জিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক।

অর্থ; হে আল্লাহ, তোমার জিকির, শুকরিয়া আর সুন্দর ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন।
(আবু দাউদ ১৫২২)

সর্বোপরি বলতে পারি, পরকালের অন্তত জীবনে প্রশান্তি পেতে চাইলে দুনিয়াতে থেকেই তার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। যার প্রস্তুতি যত সুন্দর হবে তার জন্য মৃত্যুর পরবর্তী প্রত্যেকটা ধাপ বেশি মর্যাদার হবে। তাই আমাদের উচিত কবরের জীবন সম্পর্কে সচেতন হওয়া। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। তাকওয়া অর্জন করা যেন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি ইন শা আল্লাহুল আজিজ।